চাঁদমামা

জুন ১৯৭৪

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন ও স্ক্যান করেছেন : ঝাড়গ্রাম ডেভিলস

এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরিক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

Photo by: PRASAD

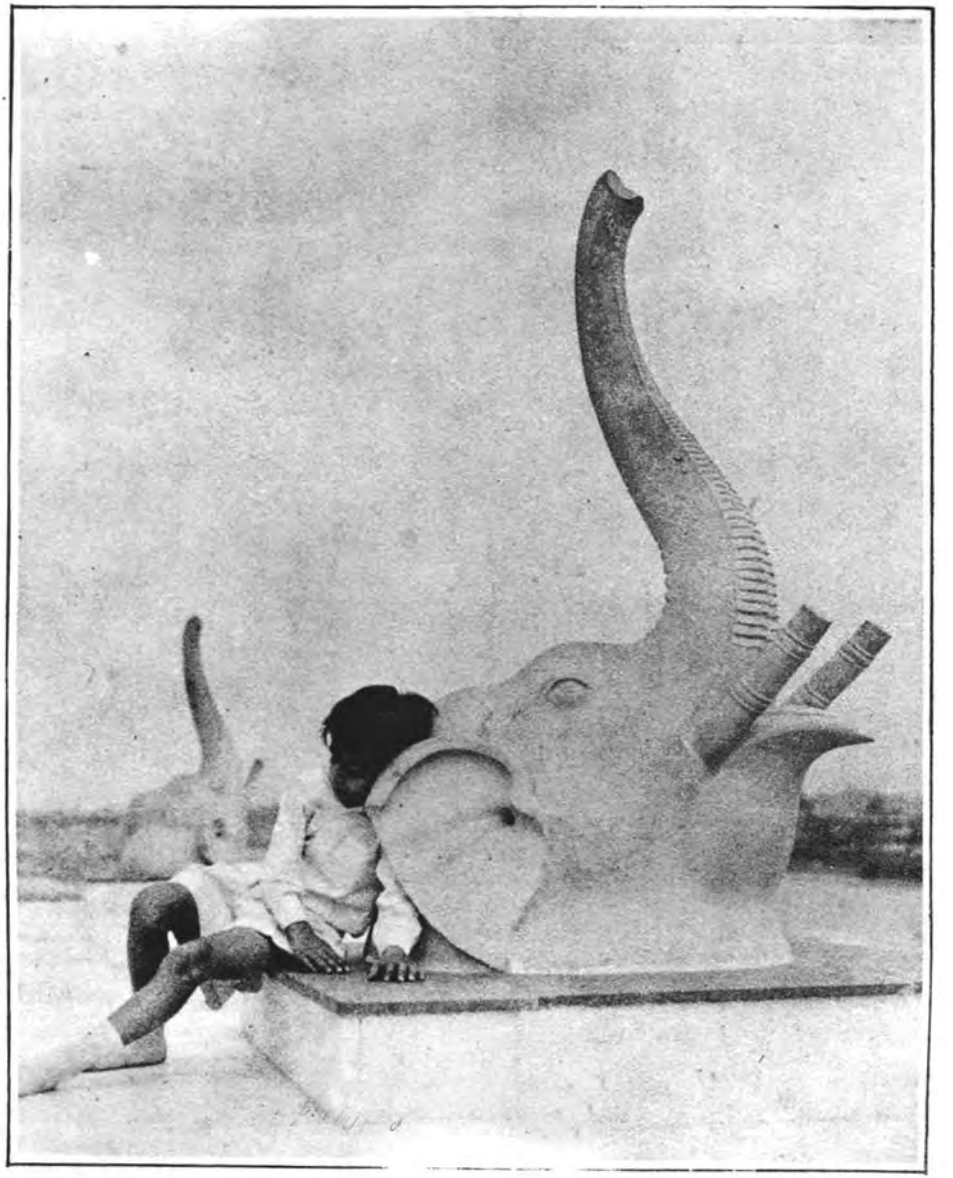

REST

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!

ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার

প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়

শিশুদের বদহজম, অম্বল,
পেটব্যাথা, বায়ু ও দাঁত উঠার
সময় ব্যাথার
একটি সুস্বাদু
সুনিশ্চিত
সমাধান

ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

EVERY LIBRARY SHOULD POSSESS!

★

'SONS OF PONDU'

Rs. 5-25

'THE NECTAR OF THE GODS'

Rs. 4-00

in English by: Mrs. Mathuram Bhoothalingam

CHILDREN'S BOOKS: WORTHY FOR PRESENTATION OR PRESERVATION

★

Order today!

DOLTON AGENCIES

'CHANDAMAMA BUILDINGS'

MADRAS - 600 026

STAMP

HARIDAS PRAJAPATI(C),
K57/47, NAWAPURA, VARANASI (U.P.)
(NEAR TO PETROL PUMP, MAIDAGIN)

PLEASE WRITE FOR PRICE LIST.

CORRESPONDENCE IN ENGLISH ONLY.

একমাত্র রুবি ডাস্ট চায়েই আপনি পাবেন একাধারে তিনটি গুণ

১. চটপট লিকার ২. চমৎকার স্বাদগন্ধ ৩. প্রতি প্যাকেটে ঢের বেশি কাপ চা

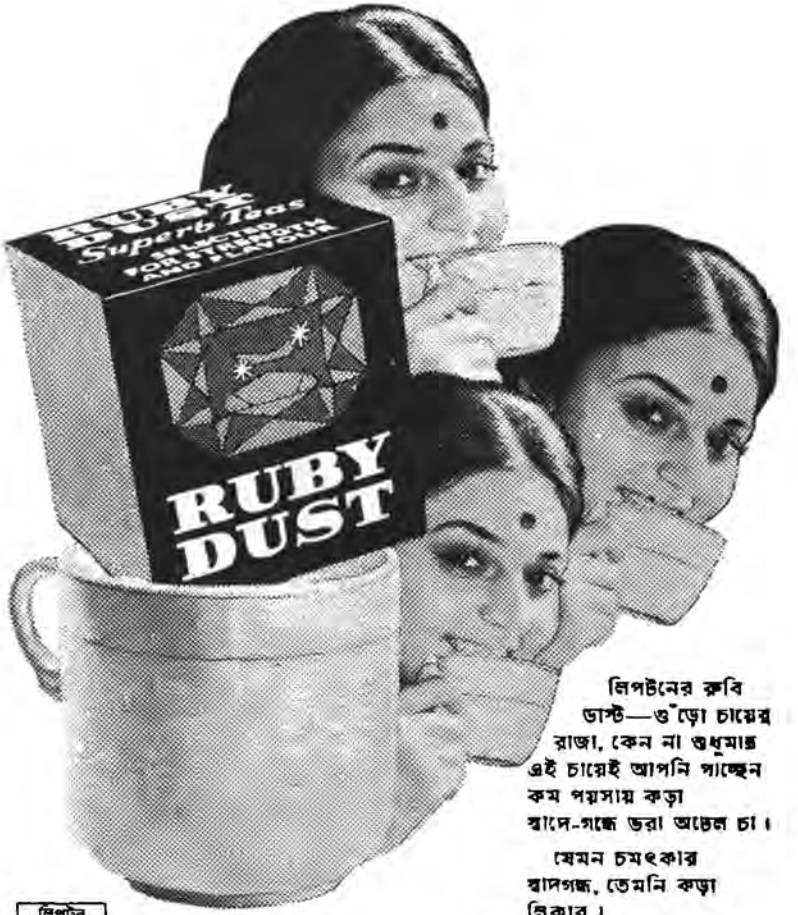

লিপটনের রুবি ডাস্ট—গুঁড়ো চায়ের রাজা, কেন না শুধুমাত্র এই চায়েই আপনি পাচ্ছেন কম পয়সায় কড়া স্বাদে-গন্ধে ভরা অঢেল চা।

যেমন চমৎকার স্বাদগন্ধ, তেমনি কড়া লিকার।

লিপটন বললেই ভালো চা
LIPTON

লিপটনের রুবি ডাস্ট আপনাকে দেবে ঢের বেশি কাপ ভালো চা

LRDC-10 BEN

আমাদের
সবার ভাল লাগে

চাঁদমামা

তোমারও লাগবে

ছোট বড় সবাই **চাঁদমামা** ভালবাসে।
পত্রিকাটি বেরোয়—বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী, তেলুগু, কন্নড, তামিল, মালয়ালম্ আর ইংরেজী মোট দশটি ভাষায়।

মন ভুলানো ছবি আর গল্পেতে ঠাসা।

চাঁদমামা ছোটদের মাসিক পত্রিকা—
কত ছোট হবে বড়, কত বড় হবে ছোট।
আজকেই **চাঁদমামা** কেনো।

গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ ডণ্টন এজেন্সীস, চাঁদমামা বিল্ডিংস, মাদ্রাজ-৬০০ ০২৬

পালন পোষণ যদি ঠিকমত চান তবে বাচ্চাদের বোর্নভিটা খাওয়ান!

পড়াশোনায় চৌকস....খেলাধুলায় ওস্তাদ

পড়াশোনায় বা খেলাধূলার চাপে ছেলে-মেয়েদের যে শক্তির অপচয় হয়, তার পূরণ না হলে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে না। প্রতিদিন বোর্নভিটা খেলে শক্তির উৎস অফুরান থাকে।

বোর্নভিটায় আছে পুষ্টিকর কোকো, দুধ, মল্ট ও চিনি— তাই এটি এত সুস্বাদু :

পুষ্টিকর বোর্নভিটায় আছে কোকো—খাদ্যগুণে ভরপুর আর স্বাদে অতুলনীয়।

শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের জন্য—
ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা!

OBM-0449-BEN.

রাম আর শ্যামের অ্যাডভেঞ্চার

ডাইনীবুড়ীর সঙ্গে মোলাকাৎ

খেতে ভাল
দেখতে ভাল
ভাবতে ভাল
পার্লে পপিন্স
মিষ্টি ফলার পার্লে পপিন্স
everest/800/PP-BN.

চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি

এবারের বেতাল কথার নাম 'মনের পরিবর্তন।' সুন্দরের পূজারী সবাই। সুন্দরকে সবাই ভালবাসে। কিন্তু সংস্কৃতি এবং সংস্কারের পার্থক্যের ফলে সেই ভালবাসা শেষ পর্যন্ত নাও টিকতে পারে। মানবতা কিন্তু মাঝে মাঝে সংস্কৃতি এবং সংস্কারের সীমারেখা অস্বীকার করে। এই হল কাহিনীর মূল বক্তব্য।

এছাড়া আরও অনেক কাহিনী আছে। ফটো-নামকরণ প্রতিযোগিতায় যে কোন পাঠক শুধু পোষ্টকার্ডের মাধ্যমেই অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

খণ্ড ২ জুন ১৯৭৪ সংখ্যা ১২

অমর বাণী

আজন্ম ন শ্‌শাঠ্যমশিক্ষিতো যঃ
তস্যা প্রমাণম্ বচনম্ জনস্যঃ,
পরাতি সন্ধান মধীয়তে যৈঃ
বিদ্যেতি তে সন্তু কিলাপ্তবাচঃ। ॥ ১ ॥

[আজন্ম যারা মিথ্যা কথা বলে না তাদের কথা কিন্তু মানুষের বিশ্বাস হয় না, অথচ যারা অন্যকে ঠকাতে ওস্তাদ তাদের মিষ্টি কথায় কত সহজেই না লোকে ভোলে।]

অর্থতুরাণাম্ ন গুরুর্ণ বন্ধুঃ,
কামাতুরাণাম ন ভয়ম ন লজ্জা,
বিদ্যাতুরাণাম্ ন সুখম্ ন নিদ্রা,
ক্ষুধাতুরাণাম্ ন রুচির্ণ বেলা। ॥ ২ ॥

[টাকার গরম যাদের থাকে তাদের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুদের কথা মনে থাকে না, কামনা বাসনা যার থাকে তার ভয় ও লজ্জা থাকে না, লেখাপড়ার ঝোঁক যার থাকে তার সুখ ও ঘুমের চিন্তা থাকে না। এইভাবে ক্ষুধার্ত মানুষের রুচি ও সময়ের খেয়াল থাকে না।]

যত্রাস্তি লক্ষ্মী বিনয়ো ন তত্র,
অভ্যাগতো যত্র ন তত্র লক্ষ্মীঃ,
উভৌচ তৌ যত্র ন তত্র বিদ্যাঃ ;
নৈকত্র সর্বোগুণ সংনিপাত। ॥ ৩ ॥

[যেখানে সম্পত্তি থাকে সেখানে বিনয় ভাব থাকে না। অতিথি যেখানে বেশি আসে সেখানে সম্পত্তি থাকে না। এই দুটো যেখানে থাকে সেখানে বিদ্যা থাকে না। কোন একটি জায়গায় সব ভাল গুণ থাকে না।]

জগতের রীতি

যক্ষপর্বত

তেইশ

[খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত অত্যন্ত কৌশলে সেনাদের ঘেরাও করে ফেলে দুর্গের মধ্যেই তাদের সবাইকে নিজেদের অধীন করে ফেলে। ওরা সবাই পাহাড়ী দুর্গের কাছে পৌঁছায়। সেখানে বীরপুরের মন্ত্রী ছিল। মন্ত্রী সমরবাহুকে বীরপুরের রাজার পক্ষ থেকে পাহাড়ী দুর্গের অধিকার দিয়ে দেয়। তারপর···]

খড়্গবর্মা, জীবদত্ত ও বীরপুরের মন্ত্রী যখন নদীর তীরে পৌঁছাল তখন রথের আকারের একটি নৌকা তীরের দিকে এগিয়ে এল। তীরের দিকে আসার সময় নৌকাকে দেখে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত বুঝতে পারল যে রথের আকারের ঐ নৌকা যক্ষের তৈরি।

জীবদত্ত বীরপুরের মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, "মহামন্ত্রী, আপনি বলেছিলেন যে এক যক্ষের কাছ থেকে আপনি আমাদের খবর পেয়েছেন। আপনি এই নৌকায় ঐ যক্ষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ? ঐ যক্ষের সঙ্গে আপনার আলাপ কোথায় হল ?"

বীরপুরের মন্ত্রী কিছুক্ষণ দোনামনা করে কি যেন ভেবে বললেন, "আমি আপনাদের কাছে কোন কিছু গোপন না করে বিস্তারিতভাবে সব কিছু বলে দিচ্ছি।

কাল রাত্রে এক যক্ষ আকাশ পথে আমার কাছে এল। রাজমহলে বান্ধবীদের মাঝ থেকে রাজকুমারীকে অপহরণ করে নিয়ে গেল। রাজকুমারী রাজার একমাত্র কন্যা। নাম বসন্তকুমারী। যক্ষ রাজমহলে যে তালপত্র ফেলে গেল তা থেকে জানতে পারলাম যে এই অপহরণের আগে সে মহারাজ পদ্মসেনের একমাত্র কন্যা পদ্মাবতীকেও একই ভাবে অপহরণ করেছে।"

মন্ত্রীর কথা শুনে রাগে ক্ষোভে কাঁপতে কাঁপতে জীবদত্ত বলল, "ঐ দুষ্ট যক্ষটা একটা বনে আমাদের কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। সে বলেছিল যে সে রাজা পদ্মসেনের অনুমতিক্রমে তার একমাত্র কন্যা পদ্মাবতীকে বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তার কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। এখন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে এই ভাবে অপহরণ করাই তার একটা পেশা অথবা নেশা। কাল পদ্মাবতীকে অপহরণ করল আজ বসন্তকুমারীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, এতো তাজ্জব ব্যাপার!"

বীরপুরের মন্ত্রী তীরের দিকে এগোতে থাকা নৌকার দিকে তাকিয়ে বলল, "জীবদত্ত পদ্মাবতীর বাবা নিজের একমাত্র কন্যাকে হারিয়ে কতখানি কষ্ট পেয়েছেন তা আমি নিজের চোখে দেখিনি কিন্তু বসন্তকুমারীকে হারিয়ে আমার রাজার যে কী পরিমাণ দুঃখ হয়েছে তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। যক্ষের ফেলে যাওয়া তালপাতা থেকে জানতে পারলাম যে আপনারা দুজনে বিন্ধাচলের কোন্ অজানা অঞ্চলেস্থিত শিলারথ সরাতে চলেছেন।"

খড়্গবর্মা ঝট করে খাপ থেকে তরবারি বের করে ঐ নৌকার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, "মহামন্ত্রী, আপনি যে শিলারথের উল্লেখ করেছেন আমরা যে সেই শিলারথ ভেঙ্গে ফেলব তাই নয় ঐ যক্ষকেও আমরা এই তরবারির আঘাতে শেষ করে ফেলব। আর তারপর অপহৃত রাজকুমারীদের, ঐ পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারীকে উদ্ধার

করে আনব। আর যদি না আনতে পারি তাহলে আমরা ক্ষত্রিয় সন্তান নই।"

ঠিক তখনই হঠাৎ জীবদত্তের মনে একটা প্রশ্ন জাগল। এটা কোন্ নৌকা? বীরপুরের মন্ত্রী জানল কি করে যে এই নৌকাতে ঐ অপহরণকারী যক্ষ আছে? না কি বীরপুরের রাজা ঐ যক্ষকে বন্দী করার জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করেছেন? বন্দী করতে কি রাজা নিজে যথেষ্ট নন? উনি কি এই মন্ত্রীকে পাঠিয়েছেন আমাদের সাহায্যের জন্য?

এই সব প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল জীবদত্তের মনে। কিছুক্ষণ ভেবে সে বীরপুরের মন্ত্রীকে বলল, "মহামন্ত্রী, আমি একটি প্রশ্ন করছি। আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি কি করে জানলেন যে রাজকুমারীদের অপহরণকারী ঐ যক্ষ এই নৌকাতেই আছে?"

এই প্রশ্ন শুনে বীরপুরের মন্ত্রী বুঝতে পারল যে তার কথায় খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের মনে বিশ্বাস জাগেনি। তখন সে নিজের পোষাকের ভিতর থেকে চওড়া তালপাতার পুঁথি বের করে জীবদত্তের হাতে দিয়ে বলল, "জীবদত্ত, এই পুঁথিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এখানে নৌকায় থাকার কথাও আছে। বিশ্বাস না হয় পড়ে দেখতে পারেন। পড়লে আরও প্রমাণ পাবেন।"

জীবদত্ত তালপাতার পুঁথি নিয়ে পুরোটা পড়ল। পড়ার পর খড়্গবর্মার হাতে দিয়ে বীরপুরের মন্ত্রীকে বলল, "মহামন্ত্রী, আপনার কথা অবিশ্বাস করার আর কোন কারণ নেই। এই যক্ষ পদ্মপুরে যে তালপাতার পুঁথি ফেলে এসেছিল তার সঙ্গে এই পুঁথির বক্তব্যে মিল আছে। এই নৌকা যে ঐ যক্ষেরই তাতে সন্দেহ নেই।"

খড়্গবর্মা ঐ পুঁথিটাকে দুবার মনোযোগ দিয়ে পড়ে বলল, "মহামন্ত্রী, এই পুঁথিটাকে আমরা কি নিজেদের কাছে রাখতে পারি? বিন্ধ্যাচলের যক্ষ পর্বতে গিয়ে ঐ যক্ষকে বন্দী করার কাজে এই

পুঁথি আমাদের বিশেষ উপকারে লাগবে বলে আমার ধারণা।"

বীরপুরের মন্ত্রী রাজী হওয়ার মত মাথা নেড়ে বলল, "এইতো নৌকাটা তীরে ভিড়ছে। এই পুঁথিতে যক্ষ লিখেছে যে নৌকাচালক তার বন্ধু। সে কোন চালাকি করছে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আপনারা দুজনে খুব সতর্ক থাকুন। আপনাদের দুজনের মধ্যে যিনি আমাদের রাজকুমারীকে উদ্ধার করবেন তাঁর সঙ্গেই রাজকুমারীর বিয়ে হবে এবং যাঁর সঙ্গে বিয়ে হবে তিনি অর্দ্ধেক রাজত্ব পাবেন।"

একথা শুনে জীবদত্ত হেসে উঠে বলল "অনেক আগে আমরা পদ্মসেনের কন্যা পদ্মাবতীকে উদ্ধার করে বিন্ধ্যাচলের শিলারথ ভেঙ্গে ফেলার প্রতিজ্ঞা করেছি। কোন রাজ্য পাবার আশায় অথবা রাজকুমারীকে বিয়ে করার কথা কোন দিন ভাবিনি। আগে আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পালন করব তারপর অন্য চিন্তা করব।"

ইতিমধ্যে ঐ নৌকা তীরে এল। বিচিত্র পোষাক পরা যক্ষের মত একজন নৌকার সামনের দিকে এসে খড়্গবর্মা ও জীবদত্তকে ইশারা করে কাছে ডাকল। ইশারা পেয়ে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত বীরপুরের মন্ত্রীকে নিয়ে নদীর তীরে এল।

যক্ষ সকলের দিকে সতর্কতার সঙ্গে তাকিয়ে বলল, "আপনাদের মধ্যে এমন কোনো মহাবীর কি আছেন যিনি বিন্ধ্যাচলের শিলারথ সরাতে পারেন?"

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত নীরবে হাত তুলল। যক্ষ পরিহাস করার ভঙ্গীতে বলল, "তাহলে আপনারা নির্ভয়ে আমার সঙ্গে এই নৌকায় উঠতে পারেন। আমার বন্ধু যক্ষ মণিরঞ্জিত যে যক্ষপর্বতে থাকেন সেখানে আমি আপনাদের নিয়ে যাব। উনি যে পদ্মাবতী ও বসন্তকুমারীকে বিয়ে করতে চান সেই রাজকুমারী দুজনও সেখানেই আছে। চলে আসুন।"

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত তীরে গিয়ে এক লাফে নৌকায় উঠল। নৌকায় উঠে

প্রথমেই বিদ্রুপ করে জীবদত্ত বলল, "মধ্য রাত্রে অসহায় অবস্থায় পেয়ে যে রাজকুমারী-দের অপহরণ করেছে, সেই যক্ষ মণিরঞ্জিতের বন্ধু তুমি ? কি তোমার নাম ?"

"আমার নাম মণিভূষণ। মনে হচ্ছে আমার বন্ধু যক্ষ মণিরঞ্জিতের বিষয়ে আপনারা কিছুই জানেন না। শৌর্যে, বীর্যে ও পরাক্রমে তার মত শক্তিশালী লোক আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। তিনি মস্ত বড় তান্ত্রিক। আপনাদের এই ধরণের উপেক্ষার আচরণ যক্ষ মণি কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। মনে হচ্ছে আপনারা এক বিরাট বিপদে পড়ার ঝুঁকি নিচ্ছেন। এসব না করে যান, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান।"

মণিভূষণের কথা শেষ হতে না হতেই জীবদত্ত নিজের হাতের দণ্ড ঐ যক্ষের কাঁধে ঠেকাল। মুহূর্তে সে বিদ্যুতের ছোঁয়া পাওয়ার মত হয়ে গেল। চমকে উঠল কিছুটা ভয়ে, কিছুটা বিস্ময়ে। তারপর বলল, "এতো এক অদ্ভুত জিনিস! মন্ত্রদণ্ড নয় তো ? আপনি কি তান্ত্রিক ?"

ওর প্রশ্ন শুনে জীবদত্ত হেসে উঠল। নিজের দণ্ড খড়্গবর্মার হাতে দিয়ে জীবদত্ত কিছুক্ষণ জপতপ করে যক্ষের ডান দিকের কাঁধে একটি আঙ্গুল ছোঁয়াল। যক্ষ তৎক্ষণাৎ আর্তনাদ করে নিচে পড়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ ঐভাবে পড়ে থেকে আস্তে আস্তে উঠে ধীরে ধীরে বলল, "আপনারই নাম জীবদত্ত না ? আপনার মন্ত্রশক্তি অপূর্ব। আপনাকে পেয়ে আমার বন্ধু খুব খুশী হবে। আপনাদের মধ্যে শত্রুতার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি ইচ্ছা করলে শিলারথ সহজেই নাড়াতে পারেন। আপনাকে শিখিয়ে দেব কিভাবে সরানো বা নড়ানো যায়। তার পরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন। শিলারথ সরানোই তো আপনাদের প্রতিজ্ঞা ? ঠিক আছে সরিয়ে ফিরে যান। কেমন ?"

খড়্গবর্মা দাঁতে দাঁত পিষে তরবারি তুলে বলল, "ওরে এই যক্ষ, বেশি

চালাকি করো না। চল, সোজা যক্ষ পর্বতে চল। তোমার বন্ধু ঐ দুই রাজকুমারীকে যদি ছেড়ে দিয়ে ক্ষমা না চায় তাহলে আমরা তাকে সহজে ছাড়ব না। টুকরো টুকরো করে কেটে তোমার বন্ধুর মাংস বিন্ধ্য অঞ্চলের কাক আর শকুনিদের খাওয়াব। কোন ক্রমেই সে পালাতে পারবে না। আমরা অপহরণের অপরাধ কোন ক্রমেই সহ্য করব না।"

দুটো সাধারণ মানুষের মেজাজ এবং স্পর্দ্ধা দেখে মণিভূষণের ভীষণ রাগ হল। সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "ওহে এই ক্ষত্রিয় বীরগণ, আমার বন্ধু যক্ষ মণিরঞ্জিত আপনাদের দুজনকে নিয়ে যেতে বলেছে। আমার কাজ সেরে চলে যাব। রাজকুমারীদের অপহরণ অথবা শিলারথের ব্যাপারে আমি কিচ্ছু জানি না।"

"এতক্ষণে মনে হচ্ছে তোমার দর্প এবং অহঙ্কার দূর হয়েছে। এখন তুমি কিছুটা ভদ্র হয়েছ মনে হচ্ছে। এখন আর দেরি না করে তুমি নৌকাটাকে মাঝ দরিয়ায় নিয়ে চল।" জীবদত্ত বলল।

তীরে দাঁড়িয়ে এই সব ঘটনা বীরপুরের মন্ত্রী এতক্ষণ দেখছিল। তাকে জীবদত্ত বলল, "মহামন্ত্রী, বিদায়। আপনার রাজাকে বলবেন, আমরা বসন্তকুমারীকে উদ্ধার করবই করব। এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা। যক্ষ মণিরঞ্জিতের মাথা কেটে আনব। সেই মাথা আপনাদের রাজা দুর্গের দরজার উপর রাখতে পারবেন। বিদায়।"

নিজের চোখে যা সব দেখল তাতে বীরপুরের মন্ত্রীর পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেল যে এই ক্ষত্রিয় যুবকরা যা বলে তা করার মত ক্ষমতা রাখে। নৌকা মাঝ দরিয়ার দিকে এগোতেই মন্ত্রী হাত নেড়ে চিৎকার করে বলল, "আপনারা যেন অল্প দিনের মধ্যেই কাজে সফল হয়ে ফিরে আসেন। আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হোক। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই নৌকাটা অনেক দূর চলে গেল। খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত নৌকার

চার দিকে ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখছিল আর ভাবছিল।

কিছুক্ষণ নৌকার চারদিক ঘুরে দেখে ওদের ধারণা হল সেই নৌকাটা বাতাসেও চলতে পারে। এদিকে মণিভূষণ ভেবেছিল সাধারণ দুটো ক্ষত্রিয় বীরকে নৌকায় চাপিয়ে আনা এমন কিছু কঠিন কাজ হবে না। খুব জোর ওরা খড়্গ যুদ্ধ ভালভাবে করতে পারে। কিন্তু খড়্গবর্মা ও জীবদত্তকে দেখে মণিভূষণের সেই ধারণা বদলে গেল। রীতিমত তাদের হাবভাব দেখে তার ভয় করছিল। এমন সময় জীবদত্ত জানতে চাইল নৌকাটা বাতাসে উড়তে পারে কিনা। একই প্রশ্ন খড়্গবর্মাও করল। মণিভূষণ ভাবল ওরা তো মন্ত্রতন্ত্র জানে হয়ত সব জেনে গেছে।

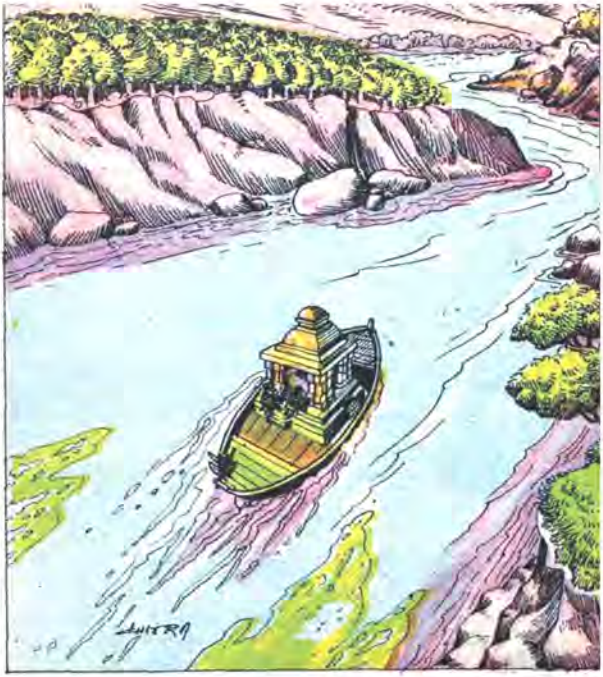

খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ কি যেন আরও ভেবে আমত আমতা করে মণিভূষণ বলল, "খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত, আকাশ পথে ঘোরাঘুরি করার জন্য মণিরঞ্জিত যে শিলারথ তৈরি করেছে এটা সেটা নয়। রথাকৃতির কোন কিছুর প্রতি মণিরঞ্জিতের আকর্ষণ প্রবল। সব কিছুই সে রথের আকৃতিতে বানাতে চায়। এমন কি তার বাড়িটাও রথাকৃতির।

জীবদত্ত রেগে গিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "তাই নাকি, বিরাট গুণী লোক তাহলে! আমাদের হাতে পড়লে আমরা তাকে রথের আকারের কোন গাছের সঙ্গেই প্রথমে বেঁধে ফেলব। রথাকৃতি বৃক্ষ কি তোমাদের যক্ষ পর্বত অঞ্চলে আছে? না থাকলে মুস্কিল!"

যক্ষ মণিভূষণ এই প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। না শোনার ভান করে অন্য দিকে তাকাতে লাগল। তারপর খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত নদীর দুই তীরের পাহাড় ও গাছপালার দিকে তাকিয়ে আনন্দ পেতে লাগল। অনুমানে বুঝতে পারল যে এই নদী পথে ওরা বিন্ধ্যাচল অঞ্চলে পৌঁছাতে পারবে। মণিভূষণকে প্রশ্ন করে জানতে পারল যে

সামনে যে পর্বত দেখা যাচ্ছে সেটাই বিন্ধ্যাচল।

"এই পর্বতাঞ্চলের কোন্ অংশে যক্ষ পর্বত আছে? আমাদের আরও কতদূর যেতে হবে?" জীবদত্ত বলল।

"আরও দশ বারো ক্রোশ বাকি আছে। তীরে নৌকা ভেড়াতে চাই। খাওয়া দাওয়া সেরে আবার নৌকা চালানো যাবে।" মণিভূষণ বলল।

নৌকাতে শুধু ফলমূল ছিল। তীরে ভিড়লে কিছু পাখী অথবা পশু শিকার করা যেত। মণিভূষণের প্রস্তাব জীবদত্তের কাছে ভালই লাগল।

জীবদত্ত এ বিষয়ে খড়্গবর্মার পরামর্শ চাইল। খড়্গবর্মা অস্তমান সূর্য ও পাহাড় পর্বতের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভালই হবে। আজকের রাতের খাবার ভালই জমবে। রাত্রে আমরা এখানেই বিশ্রাম করব। সকালে বিন্ধ্যাঞ্চলে যাওয়া যাবে।"

তারপর জীবদত্ত মণিভূষণকে বলল, "তুমি কি খড়্গবর্মার কথা শুনতে পেয়েছ? নৌকাটাকে তীরে ভেড়াও। খাওয়া দাওয়া সেরে নেওয়া যাক।"

মণিভূষণ কি যেন ভেবে থেমে থেমে বলল, "আমার বন্ধু মণিরঞ্জিত আপনাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে যেতে বলল। আজকের রাতটা এখানে কাটালে অনেক দেরি হয়ে যেতে পারে।"

মণিভূষণের কথা শুনে কঠোর স্বরে জীবদত্ত বলল, "এখানে কি করতে হবে না হবে তার নির্দেশ আমরা দেব। আমাদের নির্দেশমত তোমাকে কাজ করতে হবে। রাজকুমারীদের অপহরণকারী তোমার বন্ধু যক্ষ মণিরঞ্জিত নয়! বুঝেছ? চল, তীরে নৌকাটাকে নিয়ে চল।"

মণিভূষণ নীরবে নৌকাটাকে তীরের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

(আরও আছে)

মনের পরিবর্তন

না ছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য যথারীতি গাছে উঠে গাছ থেকে শব নাবিয়ে আগের মতই কাঁধে ফেলে হাঁটতে লাগলেন নীরবে। কিছুক্ষণ পরে শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার কাজে তোমার কঠোর পরিশ্রম সত্যি প্রশংসার। তবে ভয় হয় পাছে তুমিও বদলে যাও। ভাবি অবন্তী নগরের যুবরাজ অমরধ্বজের মত তোমারও মনের পরিবর্তন হবে কিনা। অমরধ্বজের কাহিনী বলছি। শুনতে শুনতে হাঁটলে হাঁটার পরিশ্রম কমে যাবে।"

বেতাল কাহিনী শুরু করল ঃ প্রাচীন কালে অবন্তী নগরের প্রান্তে বিরাট এক অরণ্য ছিল। বিরাট বিরাট ভয়ঙ্কর জীবের সঙ্গে লড়াই করে সেই অরণ্যে থাকত ভীল জাতের কয়েকটি পরিবার। অন্য অঞ্চলের

সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। নিজেদের খাবার নিজেদেরই এক রকম যুদ্ধ করে যোগাড় করে নিতে হত। প্রাণ রাখতে তাদের প্রাণান্ত হতে হত। নিজেদের অঞ্চলে ওরা সীমাবদ্ধ থাকত। বাকি পৃথিবীর খবর তাদের কাছে ছিল অজানা। অরণ্যের জন্তু-জানোয়ারদের হাত থেকে ওরা বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টা করত। ওদের হাত থেকে জন্তু-জানোয়ার-গুলোও বাঁচার চেষ্টা করত। ওদের এক পক্ষের আঘাতে অন্য পক্ষের মৃত্যুও ঘটত। ভীল অঞ্চলের সবাই একজনকে নেতা হিসেবে মানত। তার কথামত ওরা প্রত্যেকে চলত।

অবন্তী নগরের যুবরাজ ছিল খুব সাহসী এবং শক্তিশালী। বহুবার সে কোন অস্ত্র ব্যবহার না করে হিংস্র জন্তুকে খালি হাতে মেরে ফেলেছিল। বড় বড় বাঘ বা সিংহকে খালি হাতে ধরা বা মেরে ফেলা তার পক্ষে এমন কোন শক্ত কাজ ছিল না।

একবার এক বাঘ মারতে গিয়ে ব্যর্থ হল। বাঘ তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে লাগল। অমর-ধ্বজের মনে জিদ চাপল। সেও ছাড়ার পাত্র নয়। বাঘের পিছনে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে সে ভীল-অঞ্চলে পৌঁছে গেল। অরণ্যের ঐ অঞ্চলে যে জনমানব ছিল সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না। এদিকে সেদিকে তাকাতে তাকাতে তার নজরে পড়ল এক অপূর্ব সুন্দর জীবন্ত দৃশ্য। দেখল এক সুন্দরী যুবতী বাঘের বাচ্চার সঙ্গে খেলা করছে। এই ধরণের একটি ঘটনা অমরধ্বজ দেখা তো দূরের কথা কোন দিন ভাবতেও পারে নি। ভীলকন্যা ও অমরধ্বজ একে অন্যের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কোন গয়ণাগাটি না পরা অবস্থায়ও যে কোন রমণীকে এত সুন্দর দেখায় তা যেন যুবরাজ ভেবেও ভাবতে পারল না। ভীল ছাড়া অন্য কোন জাতের মানুষকে ভীল-কন্যা

দেখেনি কোন দিন। তাই তার কাছে যুবরাজ এক বিস্ময়। গায়ের রঙে রূপে এ যেন তাদের মত নয়। অন্য এক জগতের মানুষ। কিছুক্ষণ পরে তার মনে হল হয়ত এ কোন দেবতা। তাই সে ছুটে গেল সবাইকে খবরটা দিতে। যুবরাজও তাকে অনুসরণ করল। অল্পক্ষণের মধ্যে ভীলেরা যুবরাজ অমরধ্বজকে ঘিরে ফেলল। যুবরাজ ঠিক এই অবস্থার জন্য যেন প্রস্তুত ছিল না। পরমুহূর্তে সে চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল, "আমি অবন্তী নগরের যুবরাজ। কারো আপত্তি যদি না থাকে তো আমি এই মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।"

একথা শুনে ভীলেরা অবাক হয়ে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল। তারপর তাদের ভিতর থেকে এক বৃদ্ধ ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে অমরধ্বজকে তাদের নেতার কাছে নিয়ে গেল। ভীল নেতা যুবরাজের বক্তব্য শুনে বলল, "এই মেয়েকে বিয়ে করতে হলে তোমাকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে। রাজী আছ?"

সাহসী যুবরাজ পরীক্ষা দিতে রাজী হয়ে গেল।

"তাহলে চল।" বলে ভীলনেতা তাকে অন্য এক জায়গায় নিয়ে গেল। পরে ভীলেরা সবাই এসে সারি বেঁধে দাঁড়াল। সেই সারিতে বুড়ো-বুড়ি, যুবক-যুবতী

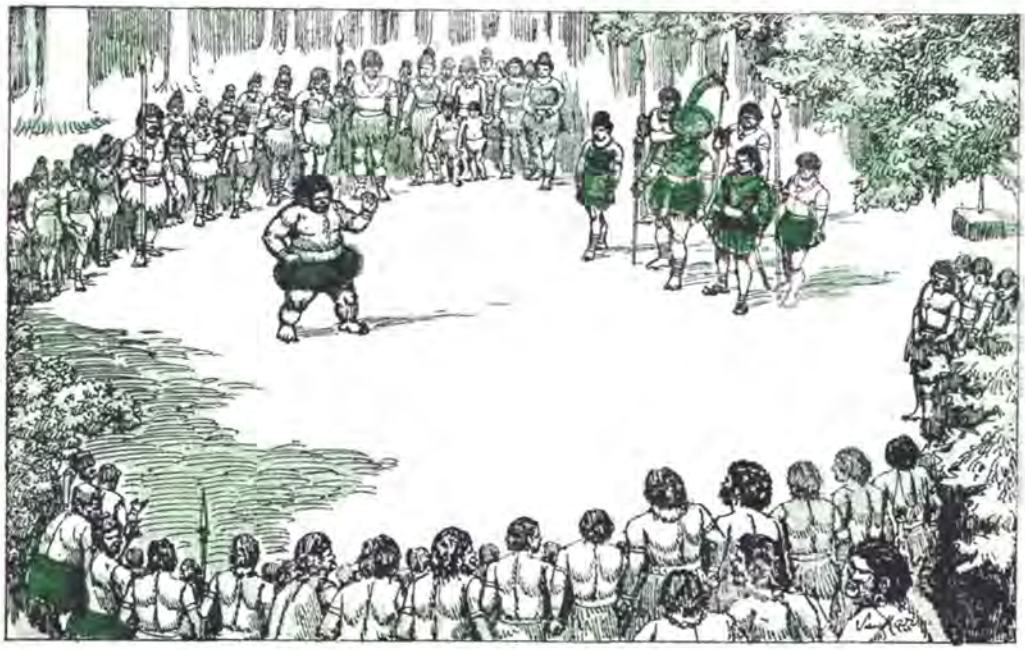

সবাই ছিল। তারা সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে এল এক বিরাটকায় শক্তিশালী মানুষ। হাতীর শরীরের মত বিরাট শরীর তার। তাকে দেখে অমরধ্বজের ঈর্ষা জাগল। তাকে দেখে অসহ্য লাগল যুবরাজের।

ঐ লোকটাকে দেখিয়ে ভীলনেতা অমরধ্বজকে বলল, "আমাদের মধ্যে এর চেয়ে শক্তিশালী লোক আর নেই। এই মেয়েকে বিয়ে করতে হলে তোমাকে এর সঙ্গে লড়তে হবে। একে হারিয়ে দিলে তবেই বিয়ে করতে পারবে। তা না হলে পারবে না।"

অমরধ্বজ ভীল নায়ককে বলল, "বিয়ের ব্যাপারে এই ধরণের পরীক্ষা নেওয়া অনুচিত। তোমাদের এই আচার অত্যন্ত খারাপ। এই লোকটাকে হারানোর জন্য দরকার পশুশক্তি। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে দেখা উচিত পাত্রের গুণ আর রূপ।"

"আমরা অরণ্যের বাসিন্দা। আমরা তোমাদের রীতিনীতি জানি না। আমাদের মত অনুযায়ী এর সঙ্গে লড়তে রাজী না হলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পার।" ভীল নায়ক বলল।

একথা শুনে অন্যেরা হাসল।

"আমি ওর সঙ্গে লড়তে রাজী আছি।" বলল অমরধ্বজ। মুহূর্তে সকলের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কঠিন নীরবতা বিরাজ করতে লাগল চারদিকে।

শুরু হল দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি। বেশিক্ষণ হল না। হঠাৎ লোকটা অমরধ্বজকে ধরে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। সবাই হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল। গোটা অঞ্চল আনন্দমুখর হয়ে গেল। ভীল-কন্যাও আনন্দে হাততালি দিতে লাগল।

লড়তে গিয়ে অমরধ্বজ টের পেল যে ভীলদের ঐ লোকটাকে যত বড় ওস্তাদ ভেবেছিল তত বড় সে নয়। তার গায়ে হাতীর শক্তি ছিল বটে তবে বুদ্ধিতে সে ছিল খাট। কুস্তির মার প্যাঁচ সে কিছুই

জানত না। যার ফলে গায়ের জোরে অমরধ্বজকে কাবু করে ছুঁড়ে ফেলতে পারল। প্রচণ্ড শক্তিতে অমরধ্বজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এলে যুবরাজ চট করে সরে গেল। ফলে নিচে পড়ে গেল লোকটা। তৎক্ষণাৎ অমরধ্বজ শক্তি এবং চমৎকার প্যাঁচের মাধ্যমে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারল। সেখান থেকে কোন রকমে উঠে এসে আবার সে অমরধ্বজকে আক্রমণ করল। এবারে আর পারল না। অমরধ্বজ আর এক প্যাঁচ কষে তাকে আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল। সবাই আর একবার হাসতে হাসতে হাততালি দিতে লাগল। ঐ ভীল-কন্যাও আনন্দে হাততালি দিল। ওদিকে লোকটা মুখ দিয়ে রক্ত তুলে মারা গেল।

ভীল-নায়ক তখন অমরধ্বজের কাঁধ চাপড়ে বলল, "তুমি সত্যিকারের যোদ্ধা। আমাদের এই মেয়েকে তুমি বিয়ে করতে পার। এখন তোমাদের দুজনের বিয়ে হতে পারে।"

"আমি আর এই মেয়েকে বিয়ে করব না। আমাকে ফিরে যেতে দাও।" অমরধ্বজ বলল ভীল নেতাকে।

অমরধ্বজের কিছু দূর যাওয়ার পর আবার ওরা সবাই তাকে ঘিরে ফেলল। ওদের নায়ক বলল, "দেখ ভাই, তুমি যাকে ছুঁড়ে মেরে ফেললে সেই লোকটাই এই মেয়েটাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। অন্য যারা চেয়েছিল তাদের অনেককেই সে হয় শোচনীয়ভাবে মারধোর করেছে নয়

মেরে ফেলেছে। এই কথা তোমাকে জানানো প্রয়োজন বোধ করেছি। আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পার।" বলল ভীলনায়ক।

ভীল নায়কের কথার পরে ওরা সবাই সরে গিয়ে তার যাওয়ার পথ ছেড়ে দিল। তখন অমরধ্বজ বলল, "আমি এখন যাব না। আমি এই মেয়েকেই বিয়ে করব।"

ভীল নায়ক ওদের দুজনের বিয়ে দিয়ে ঐ মেয়েকে অমরধ্বজের সঙ্গে তার দেশে পাঠিয়ে দিল।

বেতাল এই কাহিনী বলে বিক্রমাদিত্যকে বলল, "রাজা, অমরধ্বজ একবার বিয়ে করতে চাইল আবার বিয়ে করতে গররাজী হল কেন? সে কি ভেবেছিল যে তাকে যেতে দিয়ে পিছন দিক থেকে তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেলবে? মৃত্যুভয়ে সে বিয়ে করতে রাজী হল? আমার প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

বিক্রমাদিত্য জবাবে বললেন, "ঐ ভীল-কন্যাকে বিয়ে করতে হলে এক পশুশক্তির মোকাবিলা করতে হবে জেনেই অমরধ্বজের মনে তাদের আচার বিচারের প্রতি অশ্রদ্ধা জেগেছিল। তখনই সে ঠিক করে ফেলে-ছিল বিয়ে করবে না। মেয়েটির ভাবী বরের মৃত্যুতেও হাসতে হাসতে হাততালি দেওয়া তার ভাল লাগল না। তবু অমরধ্বজ তাকে বিয়ে করতে রাজী হওয়ার কারণ হল মেয়েটার ভাবী বরকে সে হত্যা করেছে। বীরকে ঐ মেয়েটা বিয়ে করতে চায়। তার কপালে আর বীর নাও জুটতে পারে। তাই যুবরাজ আর একবার ভেবে নিজের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করল এবং ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে চাইল।"

রাজা বিক্রমাদিত্য এই ভাবে মৌনভাব ভঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে পালিয়ে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল।

(কল্পিত)

রাজপ্রতিনিধির ঘোড়া

চিত্রসেনের আমলে মহেন্দ্রদেশে সুখ আর সমৃদ্ধির বাণ ডেকেছিল। ব্যবসাপত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ভরে গিয়েছিল। সেচের চমৎকার সুব্যবস্থা ছিল। ফলে দেশে খাদ্যের কোন অভাব ছিল না। সোনা রুপো মণি মাণিক্য প্রচুর পরিমাণে দেশে জমেছিল। বহু নগরও গড়ে উঠেছিল। সে নগরে বড় বড় অট্টালিকা ও লম্বা চওড়া রাস্তা ঘাট তৈরি হয়েছিল।

এমন এক সম্পদশালী দেশের নগরগুলো দেখাশোনার জন্য, নগরজীবন যাতে ঠিকভাবে চলে তা লক্ষ্য রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিষয় রাজাকে ভাবতে হয়েছিল।

রাজা ঠিক করলেন প্রত্যেক নগরে একজন করে রাজপ্রতিনিধি রাখবেন। রাজা ভেবেছিলেন যে রাজপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে তিনি প্রত্যেকটি নগরের দৈনন্দিন জীবনের সঠিক খবর রাখতে পারবেন।

মহেন্দ্র দেশের রাজধানীর পরেই যে নগরটি সবচেয়ে বড় তার নাম আনন্দপুর। বাছাই করে সেই নগরের জন্য একজন প্রতিনিধি ঠিক করবেন। রাজার উদ্দেশ্য এই একটি নগরে প্রতিনিধি রেখে তার ফল কেমন হয় তা ভাল ভাবে হাতেকলমে জানা। আনন্দপুর একটি বৃহত্তম নগরী হওয়ায় সেখানকার ব্যবসা বাণিজ্যও ব্যাপক। সেই নগরের জনসংখ্যা দশ লক্ষ। বিরাট বিরাট বাড়ি আর পথ ঘাট সেই নগরে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তো বটেই বিদেশীরাও যখন তখন সেই নগরে আসত। নানান উদ্দেশ্যে তারা আসত। কেউ আসত এমন এক সুন্দর নগর দেখে আনন্দ পাবার জন্য, আবার কেউ আসত

সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রচুর পয়সা রোজগারের আশায়।

চিত্রসেন এই চিন্তা ভাবনার কথা মন্ত্রী চতুরকে জানালেন।

গ্রামের মানুষ পুরুষানুক্রমে এক পাড়ায়, এক পরিবেশে থাকার ফলে একজন আর একজনকে চেনে। জানে। কিন্তু নগরে চারদিক থেকে লোক এসে থাকে। নানান জাতের নানান পরিবেশের মানুষ। তারা পরস্পরকে ভালভাবে চেনে না, জানে না।

এক জাতের অথবা একই ধরণের কাজ কর্মের মধ্যে যারা থাকে তারা যত সহজে প্রতিনিধি বাছাই করতে পারে নগরের মানুষ অত সহজে বাছাই করতে পারে না।

নগরবাসীকে দিয়ে প্রতিনিধি বাছাই করার ব্যাপারে মন্ত্রী ও রাজার মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠল। রাজা মন্ত্রীর কথা ধৈর্য্য ধরে মন দিয়ে শুনতেন এবং যুক্তি দিয়ে মন্ত্রীকে জবাব দিতেন। শেষে ঠিক হলো গোটা নগরীকে কাজ ও ব্যবসার ভিত্তিতে বারটি এলাকায় ভাগ করবেন। প্রত্যেকটি এলাকা থেকে একজন করে প্রতিনিধি বাছাই করবে এলাকাবাসী। গোটা নগরের বারজন প্রতিনিধি আবার একজনকে তাদের নেতা হিসেবে নির্বাচন করবে। ঐ নেতাই সরাসরি রাজার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

এই বিষয় দিন কয়েকের মধ্যেই আনন্দপুর নগরে ঘোষণা করে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হল। সবাই বুঝল যে একটা নির্বাচন হবে।

আনন্দপুরে সুচারু নামে একজন বিদ্বান ছিলেন। সেই নগরেই উনি জন্মেছিলেন এবং বড় হয়েছিলেন। আনন্দপুর ছিল তাঁর কাছে প্রাণ। সেই নগরের উন্নতির জন্য তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তারও অনেক কিছু করে নগরকে সমৃদ্ধির চূড়ায় উত্তীর্ণ করার উদ্দেশ্যে তিনি রাজার এই নির্বাচন পদ্ধতিকে স্বাগত জানালেন। এবং তিনি নিজেও নির্বাচনে দাঁড়ালেন।

নগর মাত্রই ব্যবসাকেন্দ্র। ব্যবসাকেন্দ্র মাত্রেই প্রচুর টাকা পয়সার আদান প্রদানের

কেন্দ্র। ফলে বহু ব্যবসায়ী এই নির্বাচনে নিজেদের মনের মত মানুষ, তাদের কথামত যারা চলবে সেই ধরণের মানুষ, তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী মানুষদের নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করালো। ব্যবসায়ীদের প্রার্থী-দের দাঁড় করানোর জন্য ওরা অঢেল টাকা ঢেলে নির্বাচকদের খুশী করেছিল। ফলে সুচারু পরাজিত হলেন এবং বারটি এলাকা থেকেই ব্যবসায়ীদের দাঁড় করানো প্রার্থী জয়ী হল।

সুচারুর পরাজয় রাজাকেও ভাবিয়ে তুলল। বারটি এলাকা থেকেই যারা নির্বাচিত হল গোপনে রাজা তাদের সম্পর্কে খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে প্রত্যেকটি প্রতিনিধি চরিত্রের দিক থেকে ভ্রষ্ট, এবং নীতির দিক থেকে বিচ্যুত। অবস্থা দেখে রাজা ভীষণ ভাবনায় পড়লেন। তাঁর চিন্তা ভাবনা সম্পর্কে জেনে মন্ত্রী চতুর রাজাকে বলল, "মহারাজ, আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম না যে এত বড় একটা নগরে নির্বাচন করে ভাল প্রতিনিধি বাছাই করা অত সহজ হবে না। যারা নগরবাসীর ভাল করতে চায়, যারা সৎ, যারা নিজের স্বার্থের কথা ভেবে কাজ করে না তারা নগরে কখনই নির্বাচিত হতে পারে না। এখন আমার অনুরোধ আপনি ঐ নির্বাচন বাতিল করে দিয়ে আপনার মনের মত এক জনকে আনন্দপুরের প্রতিনিধি ঠিক করুন।"

"এই নির্বাচনে একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে নগরবাসী গুণীকে চায়

না, ধনীকে চায়। কারণ সুচারু নির্বাচিত হতে পারেনি। কাজেই নির্বাচনকে বাতিল করাও ঠিক হবে না। ঘোষিত নিয়ম অনুসারে একজন রাজপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে। দেখা যাক ঐ বারজন কাকে নির্বাচিত করে।" রাজা চিত্রসেন বললেন।

এক সপ্তাহ দু সপ্তাহ করে এক মাস কেটে গেল। কিন্তু রাজপ্রতিনিধি নির্বাচিত হল না। খোঁজ খবর নিয়ে রাজা সেই নগরে গিয়ে জানতে চাইলেন, "কি ব্যাপার? বারজন মিলে একজনকে প্রতিনিধি করতে পারলে না?"

"মহারাজ, আপনি যখন নিজে এখানে এসেছেন, তখন অনুগ্রহ করে আমাদের মধ্যে একজনকে প্রতিনিধি ঠিক করে দিন।" ঐ বারজন প্রতিনিধি রাজার কাছে নিবেদন করার ভঙ্গীতে বলল।

মন্ত্রী চতুর রাজার খুব কাছে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, "মহারাজ, এই বারজনে মিলে নিজেদের একটা ছোট্ট সমস্যার সমাধান করতে পারছে না, এরা কি করে নগরবাসীর সমস্যার সমাধান করবে? অনুগ্রহ করে আপনি একবার ভাবুন।"

"এটা তো ওদের বিনয়ও হতে পারে? এরা যে মূর্খ তারই বা কি প্রমাণ আছে?" বললেন রাজা।

তারপর অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে ওদের মধ্য থেকে ধনগুপ্ত নামে একজনকে রাজা প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

কয়েকদিন পরেই নতুন নতুন সমস্যা আনন্দপুরে দেখা দিল। নগরের প্রত্যেক এলাকার অধিবাসী তাদের প্রতিনিধিকে নানা ধরণের কাজ তাড়াতাড়ি করার জন্য চাপ দিতে লাগল। এক এলাকায় কোন ভাল কাজ হলে তৎক্ষণাৎ সেই খবর পাশের এলাকায় চলে যেত এবং সেই এলাকার লোক অবিলম্বে সেই ধরণের ভাল কাজ করার জন্য চাপ দিত। এই নিয়ে প্রতিনিধি ও নগরবাসীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও ঝগড়া হত। শেষে উভয়

পক্ষ ঝগড়া করতে করতে রাজপ্রতিনিধি ধনগুপ্তের কাছে বিচার ও সমাধানের জন্য যেত।

ধনগুপ্ত দু একটা সমস্যার সমাধান করতে পারত, কিন্তু বেশীর ভাগ সমস্যাই সমাধান না করতে পেরে রাজার কাছে ছুটে যেত।

রাজা অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝতে পারলেন যে ধনগুপ্ত রাজপ্রতিনিধির কাজ চালানোর পক্ষে উপযুক্ত নয়।

রাজা চিত্রসেন ধৈর্য্য হারালেন না। তিনি ধনগুপ্ত যখনই আসত তার কথা শুনতেন, তার সমস্যার সমাধান করতেন এবং তাকে রাজনীতি বোঝাতেন।

কিন্তু রাজনীতি ধনগুপ্তের মাথায় ঢুকত না। তবে রাজা যে কিভাবে সমস্যার সমাধান করছেন তা সে বুঝতে পারত।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য ব্যাপারে। দিনকে দিন সমস্যা বাড়তে লাগল। যখন তখন ধনগুপ্তকে রাজার কাছে আসতে হত। রাজধানী ও আনন্দপুরের দূরত্ব অত্যন্ত বেশী হওয়ায় খুব ভাল ঘোড়ায় চেপে যেতেও ধনগুপ্তের দেড় দিন সময় লাগত। সপ্তাহে অন্তত একদিন যেতেই হত তাকে। ধনগুপ্ত নগরবাসীর টাকায় মাসে দুটো করে ঘোড়া কিনতে লাগল। একবার রাজধানী ঘুরে আসা ঘোড়া দুমাস করে বিশ্রাম পেত। আর এই ঘোড়াগুলোকে পোষার জন্য, ওদের যত্নে রাখার জন্য, ওদের খাবারের জন্য ধনগুপ্ত বিনা সঙ্কোচে প্রচুর টাকা খরচ করত।

ঘোড়াদের ভাল ভাল খাদ্য খাওয়ানোর ব্যবস্থা করল। ঘোড়া যাতে ভালভাবে বিশ্রাম পায় তার ব্যবস্থা করল। ঘোড়াগুলোর স্বাস্থ্য যাতে সবসময় ভাল থাকে। ঘোড়াগুলোর যাতে কোন রোগে না ধরে তার জন্য নামকরা ভাল ভাল চিকিৎসক নিযুক্ত করা হল।

এক বছর পরে রাজপ্রতিনিধির ঘোড়া পোষার খরচের হিসেব যখন রাজার হাতে পড়ল তখন রাজা সে হিসেবের খাত মন্ত্রীকে দেখাতে পারলেন না। কারণ এ

ধরণের বে-হিসেবী খরচের আশঙ্কা মন্ত্রী আগেই করেছিল। তবুও এক সময়ে সে হিসেব মন্ত্রীর নজরে পড়তেই রাজা বল-লেন, "ধনগুপ্ত খুব বিশ্বাসী লোক। ক্ষমতা পেয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করেনি আর আজেবাজে খরচও করেনি বলেই আমার ধারণা।"

মুখ টিপে হাসতে হাসতে মন্ত্রী চতুর বলল, "না না তা হবে কেন? যতই হোক ধনগুপ্ত তো আপনারই নির্বাচিত লোক। অতটা বে-হিসেবী হয় কি করে।"

চিত্রসেনের মনে কোথায় যেন একটু খোঁচা লাগল। উনি মন্ত্রীকে বললেন, "এক কাজ করা যাক ছদ্মবেশে গিয়ে নগরের অবস্থা নিজেদের চোখে দেখে আসা যাক। প্রতিনিধি নির্বাচনের পর নগরের উন্নতি হয়েছে কিনা জানা উচিত।"।

রাজা ও মন্ত্রী ছদ্মবেশে অন্যপথে আনন্দপুরে গেলেন। পথে যত্রতত্র ওষুধের দোকান আছে। পানীয় জলের কূয়োরও অভাব নেই সেই নগরে। দোকান পাট জমজমাট।

চিত্রসেন একজন পথিককে ডেকে বল-লেন, "আপনাদের রাজপ্রতিনিধি মনে হচ্ছে খুব ভাল লোক। এই নগরে যত ওষুধের দোকান আছে রাজধানীতেও নেই। এমন সুন্দর পথঘাট, অট্টালিকা, দোকান, রাজার প্রভৃতি এখনও রাজধানীতে তৈরি হয়নি। নগরবাসীদের যাতে সুবিধা হয় তার সব ব্যবস্থাই তো রাজপ্রতিনিধি করেছেন মনে হচ্ছে।"

কথা শুনে হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে লোকটা বলল, "আরে মশাই, আপনি কি নতুন এসেছেন আনন্দপুরে? এসব যা দেখছেন রাজপ্রতিনিধি হওয়ার আগে সুচারু মশাই অনেক খেটে খুটে করেছেন। আর সুখের কথা বলছেন? সুখ যদি পেতে হয়, রাজপ্রতিনিধির ঘোড়া হতে হয়।" বলে লোকটি চলে গেল।

রাজা চিত্রসেন বুঝতে পারলেন না যে সুখের সঙ্গে রাজপ্রতিনিধির ঘোড়ার কি

সম্বন্ধ আছে। মন্ত্রী চতুরও এমন ভাব করল যেন তার কাছেও ব্যাপারটা দুর্বোদ্ধ ঠেকেছে।

তারপর ছদ্মবেশী রাজা ও মন্ত্রী যত লোকের সঙ্গেই কথা বলেন, প্রত্যেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘোড়ার কথা তোলে। প্রত্যেকেই রাজপ্রতিনিধির ঘোড়া হবার জন্য আগামী জন্মে ঘোড়া হয়ে জন্মানোর ইচ্ছা প্রকাশ করতে থাকে।

সমস্ত নগর ঘুরে ঘুরে দেখে শেষে রাজা ও মন্ত্রী সুচারুর কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, "শুনেছি আপনি নাকি এই নগরের সমৃদ্ধির জন্য অনেক খেটেছেন? তা আপনাকে নগরবাসী নির্বাচনের মাধ্যমে রাজপ্রতিনিধি করেনি কেন?"

"নগরবাসী জানে আমাকে প্রতিনিধি করুক বা না করুক আমি যথারীতি নগরের জন্য কাজ করে যাব। তাই তারা যারা টাকা দিয়েছে তাদের নির্বাচিত করেছে।" সুচারু বললেন।

"এসব জেনে শুনে আপনি নির্বাচনে দাঁড়ালেন কেন?" রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

"ভেবেছিলাম রাজপ্রতিনিধি হয়ে আরও অনেক বেশী কাজ করার সুযোগ পাব। এই শহরকে আরও নানান উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতে পারব। কিন্তু গত নির্বাচনে আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। এত টাকার খেলা হবে আমি কোনদিন তা ভাবতে পারিনি। দেখলাম যার যত টাকা তার তত প্রভাব।

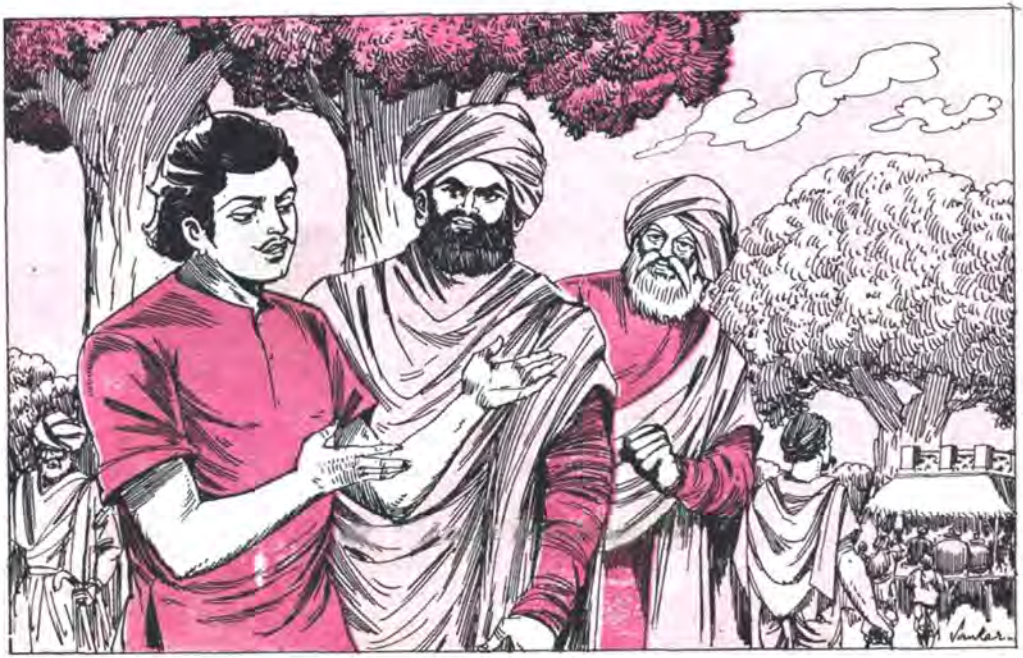

সাধারণ মানুষের বিবেক বুদ্ধি কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। টাকা যার নেই তার যেমন দরকার, যার আছে তার আরও বেশি দরকার। শেষে নির্বাচকমণ্ডলী টাকার লোভ সামলাতে পারল না। টাকার জয় হল। কুবেরদের প্রতিনিধি রাজপ্রতিনিধি নির্বাচিত হল।" বললেন সুচারু।

"যা শুনছি তাতে তো মনে হচ্ছে প্রতিনিধিদের চেয়ে অনেক বেশী কাজ করেছেন আপনি। নগরে সবচেয়ে জনপ্রিয় আপনি। আপনাকে সবাই ঈর্ষা করে।" বললেন রাজা চিত্রসেন।

"নগরের লোক আমাকে ঈর্ষা করতে যাবে কোন দুঃখে? রাজপ্রতিনিধির ঘোড়া থাকতে? ভাবছি ঘোড়াদের সেবায় নগরবাসী না ফতুর হয়ে যায়। আর বেচারা রাজপ্রতিনিধিকেই বা দোষ দিয়ে কি লাভ? কি যে খেয়াল হল রাজার সারা দেশের মধ্যে হঠাৎ তার এই আনন্দপুরের উপর নজর পড়ল। বারটা ভাগ করলেন এই আনন্দপুরকে। রাজপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি বাছাই করলেন ধনগুপ্তকে। কিন্তু এই অর্থলোভী ধনগুপ্তের না আছে বুদ্ধি না আছে পরিশ্রম করার কোন ক্ষমতা। শেষ পর্যন্ত একমাত্র তার ঘোড়াই ভরসা।" সুচারু বললেন।

রাজা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, নগরের সকলের মুখেই রাজপ্রতিনিধির ঘোড়ার কথা। এই রহস্যের অনুসন্ধান করার জন্য তিনি মন্ত্রীকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ রাজপ্রতিনিধির অশ্বশালা দেখতে গেলেন। দেখে তো অবাক। সে যেন অশ্বশালা নয়। প্রাসাদের অন্দর মহল। সেই মুহূর্তে রাজা রাজপ্রতিনিধির ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সুচারুকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন।

পরের বছর সুচারুর কাছ থেকে ঘোড়ার পেছনে খরচের কোন হিসেব রাজার কাছে গেল না।

ঠেকে শেখার পরে

কোন গ্রামে রাজু নামে এক ছেলে ছিল। তার আত্মীয় বলতে কেউ ছিল না। সে বড় হলে পাশের গ্রামের এক মেয়ে তার কপালে জুটে গেল। তাকে বিয়ে করল। মেয়ের নাম শোভা।

কয়েক বছর পরে শোভা তার স্বামী রাজুকে বলল, "পূজোতে কিন্তু মুর্শিদাবাদের সিল্কের শাড়ি চাই। বোস গিন্নী এবার পিয়োর সিল্কের শাড়ি কিনছেন।"

সে কথা শুনে রাজু বলল, "বোস গিন্নী কিনতে পারে। ওদের তো টাকার অভাব নেই। তাই বলে তাদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে কি আর আমি পারব!"

"কোনদিন কিছু মুখ ফুটে চাই নি। আজ একটা ভারি তো শাড়ি চাইলাম তাও দেবার মুরোদ নেই। আমার বাপের কাছে আমি কোনদিন মুখ ফুটে চাই না তাই, না হলে চাওয়ার সাথে সাথে পেয়ে যেতাম।" বলল শোভা।

"বেশ তো, যাওনা, নিয়ে এস না একটা। দেখি কত বড় মুরোদ।" রাজু বলল।

দু-তিনদিন কর্তা গিন্নীর কথাবার্তা বন্ধ। সিল্কের শাড়ি না আনলে ইজ্জত থাকবে না ভেবে শোভা বাপের বাড়ি যেতে চাইল। রাজু কথা না বাড়িয়ে যেতে দিল।

ইতিমধ্যে রাজু প্রথম দিনে যে শোভার সঙ্গে শাড়ি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শ্বশুর মহাশয়ের কাছে চিঠি লিখে দিল।

শোভা যাওয়ার সময় রাজুকে বলে গেল, "আমি যদি শাড়ি নিয়ে না ফিরি তো আমার নাম নেই। চল্লাম বাপের বাড়ি।"

বাপের বাড়ির সামনে গরুর গাড়ি থেকে নেমে এঘর-ওঘর খুঁজে দেখে মা নেই।

স্বর্ণা দাস

বাবা আরাম কেদারায় বসে আছে। ওর বাবা বলল, "কিরে মা, একা এসেছিস ? জামাই এল না কেন ? কি ব্যাপার ? জামাইয়ের শরীর ভাল আছে তো ?"

"আছে। কাজে জড়িয়ে আছে। কাজ কামাই দিয়ে শ্বশুরবাড়ি আসার তার সময় নেই। মা কোথায় ? তোমাদের দুজনকে দেখতে এলাম। মা কোই ?" শোভা জিজ্ঞেস করল।

"তোর মার কথা আর জিজ্ঞেস করিস না। আমার সঙ্গে ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে গেছে।" শোভার বাবা বলল।

"তোমরা আবার ঝগড়া আরম্ভ করেছ ?"

"আমার কি দোষ বল। আগামী পূজোতে তোর মা একটা সিল্কের শাড়ি চায়। আমি কিনতে পারব না বলেছিলাম। এইতো তোর বিয়েতে যত খরচ করেছি, সেই ধারটাই এখনো মেটেনি। আচ্ছা তুই বল ধার করে আগে ধার শোধ করা উচিত না সিল্কের শাড়ি কেনা উচিত ?" শোভার বাবা বলল।

কথাগুলো কানের ভিতর দিয়ে শোভার মনে যেন গেঁথে গেল। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে সে ফিরে যেতে চাইল।

"সে কি ! এই এলি এখনই যাবি কি, দুদিন থাক।" শোভার বাবা বলল।

"না বাবা, আমাকে যেতে হবে। মা এলে বলি—" শোভার কথা শেষ হতে না হতেই শোভার বাবা বলল, "কি বলব ?"

"বল যে এভাবে ঝগড়া করা উচিত নয়। আগে ধার মেটাতে হয়। অভাবের সংসারে সিল্কের শাড়ি না পরলে কি চলে না ? আমি চললাম।" শোভা বলে চলে গেল।

তারপর পাশের বাড়ি থেকে শোভার মা এসে স্বামীকে বলল, "জামাই শ্বশুরে মিলে কচি মেয়েটাকে এভাবে জব্দ না করলে কি তোমাদের শান্তি হত না।" পরে শোভার মা ও বাবা হাসতে লাগল।

চোরের উপর বাটপাড়ি

একজন ব্রাহ্মণ গুরু প্রত্যেক বছর বহু গ্রাম ঘুরে যজমানদের বাড়ি থেকে বাৎসরিক দক্ষিণা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতেন। তাঁর পোঁটলা পুঁটলি বহন করার জন্য দুজন চাকর থাকত। আগের বছর ভাল ফসল হওয়াতে যজমানদের কাছ থেকে সে বছর ভাল দক্ষিণা পেয়েছিলেন ঐ গুরু। ফলে চাকর দুজনের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছিল। তখন ব্রাহ্মণ গুরু সমস্ত জিনিস বড় বড় পোঁটলা করে দুটি পোঁটলা দুজন চাকরকে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বাকি একটি নিয়ে গুরু একটি ধর্মশালায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। দুজনের একজন চাকরকে বাড়িতে পোঁটলা রেখে ফিরে আসতে বললেন সেই আশ্রমে। সে ফিরে এলে পোঁটলাটা তার মাথায় রেখে গুরু তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন।

বিরাট এক পোঁটলা নিয়ে ধর্মশালায় ঐ গুরুকে উঠতে দেখল দুজন ধোকাবাজ। গুরুর ঐ পোঁটলা নিয়ে পালানোর তাল করল ঐ দুজন ধোকাবাজ। কিন্তু গুরুর অতিরিক্ত সাবধানতার ফলে তারা তা পারল না।

শেষে ওদের মধ্যে বড় ধোকাবাজটি একটি গাধা নিয়ে সেখানে এসে ব্রাহ্মণ গুরুকে বলল, "আজ্ঞে বাবু, আমি কি আপনার কোন সেবা করতে পারি? আপনি একা এই বোঁচকা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। আপনি বললে এই বোঁচকাটা আপনার বাড়ি বয়ে দিয়ে আসতে পারি?"

"কোন দরকার নেই। আমার দুজন চাকর দুটো বোঁচকা নিয়ে বাড়ি গেছে। ওদের মধ্যে একজন ফিরে এসে এই বোঁচকাটাকে নিয়ে যাবে।" বললেন ব্রাহ্মণ।

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

বড় ধোকাবাজটা গুরুর কাছে ঐ চাকরের

ফেরার কথা শুনে সে সেখান থেকে সরে গিয়ে ছোট ধোকাবাজকে ঐ চাকরের আসার পথে এগিয়ে যেতে বলল। ও যেন ঐ চাকরকে ফিরে যেতে বলে। কারণ হিসেবে ছোট ধোকাবাজ যেন তাকে বলে যে ব্রাহ্মণের যেতে দেরি আছে।

এদিকে ব্রাহ্মণ তাঁর চাকরের আসার অপেক্ষা করতে করতে চারদিন কাটিয়ে দিলেন। চারদিনেও চাকরের না ফিরে আসাতে ব্রাহ্মণ খুব উদ্বিগ্ন হলেন। তাঁর বাড়ির পূজো ঘটা করে করার দিন এগিয়ে আসছে। দু-একদিনের মধ্যে বাড়ি ফিরতে না পারলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

তাঁর মনের অবস্থা যখন অস্থির তখন সেই বড় ধোকাবাজটি এসে তাঁকে বলল, "ঠাকুর, আমাকে কাজটা দেবেন না? আমার গাধা আছে। গাধার পিঠে চাপিয়ে আপনার বোঁচকা নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আপনার বাড়ি পৌঁছে যাব। আপনিও সঙ্গে থাকবেন। বাবু, দয়া হবে না?"

"তোমার গাধার পিঠে আমার এই বোঁচকাটা চাপিয়ে আমার বাড়ি পৌঁছে দেবে?" ব্রাহ্মণ জিজ্ঞেস করলেন।

"কত দেবেন ঠাকুর?" বড় ধোকাবাজ জিজ্ঞেস করল।

"পাঁচ টাকা দেব।" ব্রাহ্মণ বললেন।

তৎক্ষণাৎ বড় ধোকাবাজ মহানন্দে রাজী হয়ে গেল।

গাধার পিঠে পোঁটলা চাপিয়ে ধোকা-বাজের সঙ্গে ব্রাহ্মণ রওনা হলেন। মাইল খানেক যাওয়ার পর ছোট ধোকাবাজ পুলিশের পোষাক পরে ওদের সামনে এসে বলল, "এই তো সেই গাধা। রঘু ধোপার গাধা আজ এক সপ্তাহ নিখোঁজ। এইটাই সেটা।"

"আজ্ঞে না এই গাধাটি আমি গত বছর ত্রিশ টাকা দিয়ে কিনেছি।" বড় ধোকা-বাজ বলল।

"এক্ষুণি প্রমাণ হয়ে যাবে। রঘু ধোপার গাধার বাঁ দিকের কানে ঘায়ের দাগ আছে।

আর তার সামনের দাঁত ভাঙ্গা। দেখি ?" ছোট ধোকাবাজ বলল।

ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে একটা একটা চিহ্ন দেখতে লাগলেন। সব মিলে যাচ্ছে দেখে ব্রাহ্মণ গুরু অবাক হয়ে গেলেন।

"সে অমন অনেক গাধার কানে ঘা থাকে, দাঁত ভাঙ্গা থাকে।" আমতা আমতা করে বড় ধোকাবাজ বলল।

ঠিক পুলিশের ভঙ্গিতে গর্জে উঠে ছোট ধোকাবাজ বলল, "পায়ে নীল রঙের দাগ আছে। গায়ে রঘুর নাম লেখা আছে।"

ব্রাহ্মণ গুরু বড় বড় চোখে দেখলেন, রঘুর নাম লেখা আছে গাধার পায়ে।

তারপর আরও অনেক তর্কবিতর্ক ও কথা কাটাকাটি হল। হঠাৎ এক সময় বড় ধোকাবাজ গাধা নিয়ে পালানোর অভিনয় করল। তৎক্ষণাৎ ছোট ধোকাবাজ অভিনয় শুরু করে দিল। সে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ব্রাহ্মণকে বলল, "আপনাকে থানায় যেতে হবে সাক্ষী দিতে। চলুন তাড়াতাড়ি।"

ছোট ধোকাবাজ যা বলল তা শুনে ব্রাহ্মণ গুরুর মাথায় যেন বাজ পড়ল। ভয়ে আতঙ্কে তার মুখ দিয়ে কথা সরল না।

"আজ্ঞে আমাকে আর এর ভেতরে টেনে ফেলছেন কেন ? আমি এই চুরির ব্যাপারে কিছুই জানি না।" কাতরকণ্ঠে সবিনয়ে ব্রাহ্মণ বলল।

"যাবেন না মানে ? আপনার সামনে এতবড় একটা চুরি ধরেছি। আর আপনি যাবেন না ? বিচারকের সামনেও আপনাকে হাজির হয়ে আসল ঘটনা বলতে হবে।" ছোট ধোকাবাজ বলল।

"আজ্ঞে আপনাকে একশোটা টাকা দিচ্ছি, আপনি আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন।" ব্রাহ্মণ কাকুতি মিনতি করে সবিনয়ে বললেন।

"তা না হয় ছাড়লাম। কিন্তু আমি গাধাটাকে তো ছাড়তে পারি না ? আপনি পোঁটলাটা মাথায় করে নিয়ে যেতে পারবেন না ?" ছোট ধোকাবাজ ব্রাহ্মণের প্রতি যেন সহানুভূতির সুরে বলল।

"আজ্ঞে আপনি বলে দিন এখন আমি কি করব ? কোথায় যাব ? ঐ বোঁচকাটা মাথায় রাখলে আমি মাটিতে বসে পড়ব।" ব্রাহ্মণ বললেন।

"রাত হয়ে গেল ! আমাকেই যত ঝামেলা পোয়াতে হবে দেখছি। এক কাজ করুন, আজকের রাতটা আপনি এই চোর আর এই গাধাকে নিয়ে আমার বাড়িতেই থাকুন। কাল সকালে আর একটা গাধা কিনে তার পিঠে এই পোঁটলা চাপিয়ে আপনাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব।" ছোট ধোকাবাজ এমনভাবে বলল যেন ব্রাহ্মণের অসহায় অবস্থার কথা বুঝে তাঁর প্রতি তার দরদ উথলে পড়ছে।

অন্য কোন উপায় না থাকায় ব্রাহ্মণ রাজী হয়ে গেল। পরের দিন ছোট ধোকাবাজকে একশো টাকা উপহার দিয়ে এবং পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটি গাধা কিনে ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরলেন।

বাড়িতে এসে পোঁটলা খুলে ব্রাহ্মণ দেখেন তাতে শুধু ন্যাকড়া আর ইট পাটকেল রয়েছে। ঐ পোঁটলাতে প্রায় এক হাজার টাকার জিনিস ছিল। সবই গেছে ; ব্রাহ্মণ বুঝলেন যে তিনি চোর জোচ্চরদের হাতে পড়েছিলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, "ঐ সব জঘন্য কুকুরদের মাথায় উপযুক্ত মুগুর দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে শাস্তি দেবেন।"

তাঁর বাড়ির পূজো যথারীতি খুব ঘটা করে হয়েছিল। নানা জায়গার লোক ঐ পূজো উপলক্ষে তাঁর বাড়িতে এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন জাদুকরও ছিল। সেই জাদুকর ব্রাহ্মণের কাছ থেকে সব কথা শুনে, ধোকাবাজদের শাস্তি দেওয়ার তাঁর যে ইচ্ছা ছিল তা পূরণের জন্য সব ব্যবস্থা করল। ব্রাহ্মণকে পরচুলা পরতে হবে, দাড়ি গোঁফ বাড়াতে হবে, পাচকের পোষাক পরতে হবে এবং একটা থলেতে জাদুকরের দেওয়া একটা জিনিস লুকিয়ে রাখতে হবে। জাদুকরের কথামত কাজ করলে ঐ ধোকাবাজদের শাস্তি দেওয়া সম্ভব হবে।

জাদুকরের নির্দেশ মত সব করে ব্রাহ্মণ যে বাড়িতে সেদিন ছিলেন সেই বাড়িতে গিয়ে ছোট ধোকাবাজকে ভাল ভাল কথা বলে তাদের বাড়িতে পাচক হিসেবে থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। সেই বাড়িতে বড় ধোকাবাজও ছিল। ওদের রান্না করার লোক না থাকায় ওরা ব্রাহ্মণকে পাচক হিসেবে রাখল। ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশে থাকায় তাঁকে কোন ধোকাবাজই চিনতে পারল না। ব্রাহ্মণ ভাল ভাল রান্না করতে পারতেন।

একদিন রাত্রে ওরা চুরি করে ফিরলে ব্রাহ্মণ তাদের ভাল ভাল মিষ্টি তৈরি করে খেতে দিল। অত ভাল মিষ্টি ওরা জীবনে কোনদিন খায়নি।

মিষ্টি খেয়ে খুশী হয়ে ওরা মহানন্দে ব্রাহ্মণের সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করে দিল।

"কি হে ? এত ভাল মিষ্টি তো কোন-দিন করনি ? আজ করলে কোন্ আনন্দে ?" বড় ধোকাবাজ জিজ্ঞেস করল।

"গত শনিবার যখন আমাদের বাড়িতে অতিথিরা এসেছিল সেদিন এই মিষ্টি করলে না কেন ?" ছোট ধোকাবাজ কথার পিঠে আর এক কথা বলল।

"এত ভাল মিষ্টি খাইয়েছ তার জন্য এখন তুমি যা চাইবে তাই দেব।" বড় ধোকাবাজ বলল।

"দেখুন, এই যে মিষ্টি করতে পেরেছি এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। এ সবই যোগীশ্বরের মহিমা। আজ দুপুরে উনি এসেছিলেন। উনি যে কত বড় শক্তিমান কি বলব। আমার উপর খুশী হয়ে আমাকে এই চোঙ্গা উপহার দিয়েছেন। বিচিত্র এই চোঙ্গা। গমের উপর রাখতেই এই মিষ্টি হয়ে গেল।" বলে ব্রাহ্মণ চোখ বুজে এমন ভাবে প্রণাম করলেন যেন যোগীশ্বর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

"মিথ্যা কথা।" বড় ধোকাবাজ চোখ পাকিয়ে বলল।

"আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন তাতে তো আমার কিছু যাবে আসবে না ?

তবে দয়া করে আগামী সোমবারের মধ্যে আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন। এই চোঙ্গা দিয়ে মিষ্টি বানিয়ে আমি স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে থাকব। একটা অসুবিধা অবশ্য আছে শুধু সোমবার এক ঘণ্টার মধ্যে যত ইচ্ছে মিষ্টি বানানো যাবে। আমি যদি ঐ এক ঘণ্টার মধ্যে এক হাজারটা মিষ্টি বানাতে পারি, আর একটা মিষ্টি যদি কুড়ি পয়সা করে বিক্রি করি তাহলেও তো সপ্তাহে দুশো টাকা পাব। আর মাসে আটশো টাকা হয়ে যাবে। চাকরের কাজ করার আমার কোন দরকার নেই। আমি এক-জনকে চাকর রাখতে পারব।" ব্রাহ্মণ বলল।

"গমকে মিষ্টি বানানোর কথা যে বলছ তা তুমি প্রমাণ করতে পারবে?" ধোকা-বাজরা জিজ্ঞেস করল।

"কেন পারবো না? আপনাদের বিশ্বাস না হলে আসুক সোমবার দেখিয়ে দেব।" ব্রাহ্মণ বললেন।

দিন কয়েক কাটার পর রবিবার রাত্রে ব্রাহ্মণ তার বন্ধুর দেওয়া চোঙ্গাটাকে দেখে নিলেন। চোঙ্গাটা দুটো পিসবোর্ড দিয়ে তৈরি। তার সঙ্গে বন্ধুটি একটি কাঁচের গ্লাসও দিয়েছিল। একটা চোঙ্গা ঐ গ্লাসের চেয়ে একটু বড়। অর্থাৎ চোঙ্গা দিয়ে গ্লাসটাকে ঢাকা যায়। ঐ চোঙ্গার একটি মুখ বন্ধ। আর ঐ বন্ধ দিকে তর্জনী ঢোকার মত ছিদ্র ছিল। অন্য চোঙ্গাটা গ্লাসের চেয়ে একটু ছোট যাতে ঐ চোঙ্গা গ্লাসে ঢুকতে পারে মাপে মাপে। তার একটি দিক ঢাকা তবে তর্জনী ঢোকার মত ছিদ্র ছিল। চোঙ্গার বাইরের দিকটায় আঠা দিয়ে গম লাগানো ছিল। যে দিকে বন্ধ ছিল সেখানেও গম লাগানো ছিল। ফলে ঐ ছোট চোঙ্গাটা গ্লাসে ঢুকিয়ে দিলে দূর থেকে দেখলে তো বটেই কাছে থেকে দেখলেও মনে হবে গ্লাস ভর্তি গম আছে।

ব্রাহ্মণ তৈরি করা মিষ্টি ঐ ছোট চোঙ্গাতে রেখে সেই চোঙ্গাটা গ্লাসে উপুড়

করে রাখলেন। চোঙ্গার ছিদ্রযুক্ত ঢাকা দিকটা গ্লাসের উপরের দিকটায় ছিল। ফলে মনে হচ্ছিল গ্লাস ভর্তি গম আছে। তার উপর আলতো ভাবে কয়েক দানা গম ফুটোর আশেপাশে ছড়িয়ে রাখলেন।

সোমবার সকালে শুদ্ধভাবে স্নান করে ঐ কাঁচের গ্লাসটাকে নিয়ে চোরদের দেখিয়ে একটি উঁচু জায়গায় গ্লাসটিকে রাখলেন। তারপর কিছুক্ষণ বিড় বিড় করে কি যেন বললেন। পরে গ্লাসে ফুঁ দিলেন। ফুঁ দিতেই উপরে আলতো ভাবে ছড়ানো গম গুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ধোকা-বাজরা পরিষ্কার বুঝতে পারল যে গ্লাসে সত্যি সত্যি গম ছিল।

তারপর ব্রাহ্মণ বড় চোঙ্গা সবাইকে দেখিয়ে সেটাকে কাঁচের গ্লাসের উপরে এমন ভাবে রাখলেন যাতে ঐ ছিদ্রযুক্ত ঢাকা অংশটি উপরের দিকে থাকে। গ্লাস ঢেকে দিল ঐ চোঙ্গা। মুহূর্তকাল ধ্যান করার মত অভিনয় করে বড় চোঙ্গাটির ছিদ্র দিয়ে ছোট চোঙ্গাটির ছিদ্রে আঙ্গুল ঢুকিয়ে ছোট চোঙ্গাটি গ্লাস থেকে তুলে ফেললেন। ছোট চোঙ্গাটি বড় চোঙ্গার খাপে খাপে ঢোকার মত তৈরি হওয়ায় ধোকাবাজরা মনে করল সব মিলিয়ে একটাই চোঙ্গা। গ্লাসে পড়ে রইল মিষ্টি। ধোকাবাজরা দেখে তো অবাক। তাদের মাথা ঘুরে গেল। গম

থেকে যে এভাবে মিষ্টি হয় তা ওরা জীবনে এই প্রথম চোখের সামনে দেখল।

মিষ্টি ওরা হাতে নিয়ে খেল। ব্রাহ্মণ তখন ঐ চোঙ্গাটাকে নিজের পোঁটলায় পুরে অনুমতি নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার ভঙ্গী করলেন।

"আচ্ছা আবার মিষ্টি বানাও তো?" ওরা বলল।

"আমার কাছে তো আর গম নেই?" ব্রাহ্মণ বললেন।

"আমরা আনছি।" ওরা বলল।

"আপনাদের গম আনতে আনতে একঘণ্টা কাবার হয়ে যাবে। তখন আর এই চোঙ্গা দিয়ে কোন কাজ হবে না। ব্রাহ্মণ বললেন।

তারপর ঐ দুজন ধোকাবাজ নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কথা বলে ব্রাহ্মণকে বলল, "তুমি এই চোঙ্গা আমাদের কাছে বিক্রি করে দাও। কত টাকা নেবে বল, আমরা দেব।"

"ওরে বাবা এ আমি বিক্রি করতে পারব না। এ আমার যোগীশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ সহ পাওয়া জিনিস।" উদ্বেগের অভিনয় করতে করতে অদ্ভুতভাবে বললেন ব্রাহ্মণ।

ওরা একশো, দুশো, পাঁচশো, এক হাজার টাকা দিতে চাইল। তবু ব্রাহ্মণ বিক্রি করতে রাজী হলেন না।

"ঠিক আছে। শেষ কথা বলছি। দু-হাজার টাকা দেব। আমাদের কাছে বিক্রি করে দাও। আর যদি তা না কর তাহলে আমরা কেড়ে নেব।" বড় চোর চোখ বড় বড় করে ভয় পাইয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলল।

"ঠিক আছে। আমিও শেষ কথা বলছি। আড়াই হাজার টাকা দিয়ে দিন।" বললেন ব্রাহ্মণ।

তারপর ব্রাহ্মণ আড়াই হাজার টাকা ওদের কাছ থেকে নিয়ে ছোট চোঙ্গাটি নিজের থলিতে গোপনে রেখে দিয়ে বড় চোঙ্গাটি ওদের হাতে দিয়ে বললেন, "আগামী সোমবার এটা দিয়ে আপনারা যত ইচ্ছে মিষ্টি বানাতে পারবেন। তবে গম মজুত রাখতে ভুলবেন না।"

ফেরার পথে ব্রাহ্মণ পরচুলা ফেলে দিয়ে গোঁফ দাড়ি কামিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

এদিকে পরের সোমবার ঐ দুজন ধোকাবাজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টা করেও মিষ্টি বানাতে পারল না। ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, "রান্না করতে এসে লোকটা আমাদের মত ধোকাবাজদেরই ধোকা দিয়ে দিল? একেবারে চোরের উপর বাটপাড়ি!"

দুটো বর

প্রাচীনকালে সত্যকীর্তি নামে এক যুবক ছিল। তার যখন বয়স পাঁচ কি ছয় তখন তার বাবা মারা গেল।

সত্যকীর্তি দিদিমার কাছে বড় হল। দিদিমা মারা যাওয়ার সময় তাকে দুটো মূর্তি দিয়ে বলল, "ভাই, এই দুটো মূর্তির পূজা করো। তোমার ভাল হবে।"

দিদিমার মৃত্যুর পর সত্যকীর্তি ভেবে পেল না কি খাবে, কিভাবে বাঁচবে। শেষে একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে সে এক বনে পৌঁছে গেল।

সেই বনের একটা কুঁড়ে ঘর থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এলে সত্যকীর্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, "মা, আপনি আমাকে এমন একটা জায়গার সন্ধান দিন যেখানে এই দুটো মূর্তি রেখে পূজো করতে পারি এবং দুমুঠো খেতে পাই।"

তার কথা শুনে মহিলা হেসে বলল, "সোজা আরও কিছুদূর গেলে তুমি একটি টিলা দেখতে পাবে। সেখানে গাছ আছে। সেই গাছে ফলও আছে প্রচুর। আর একটি পোড়ো বাড়ি আছে। সেখানে তুমি থাকতে পারবে, ফল খেয়ে বাঁচতেও পারবে।"

সত্যকীর্তি ঐ মহিলাকে প্রণাম করে সোজা এগিয়ে গেল। যথাস্থানে টিলা পেল। পোড়ো বাড়িও ছিল সেখানে। গাছ ফলের ভারে নুয়ে পড়েছিল। সত্যকীর্তি পোড়ো বাড়িতে থেকে ফল খেয়ে পূজো করতে লাগল।

কিছুদিন পরে এক দেবী দর্শন দিয়ে বললেন, "বাছা, আমি তোমার পূজায় সন্তুষ্ট। কি বর চাও বল।"

"আপনি কোন্ দেবী?" সত্যকীর্তি অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

ধৃতিমান মুখোপাধ্যায়

"আমি স্বার্থদেবী। যে বরে তোমার স্বার্থ আছে সেই বর চাইলে আমি দিতে পারি।" দেবী বললেন।

"দেবী আপনি হঠাৎ দেখা দিলেন। আমি তো আগে থেকে ভাবিনি কি বর চাইব? আপনি অনুগ্রহ করে কাল আর একবার দর্শন দিয়ে আমি যে বর চাইব সেই বর দেবেন।" সত্যকীর্তি বলল।

মুহূর্তে স্বার্থদেবী অদৃশ্য হলেন।

সত্যকীর্তি বুঝতে পারল না স্বার্থ কথার মানে কি? কিছুক্ষণ ভেবে সে ছুটে গেল ঐ মহিলার কাছে। তাকে জিজ্ঞেস করল, "স্বার্থ কথাটার মানে কি? স্বার্থ কি জিনিস?"

"সে বাবা অনেক কথা। ভেতরে এস। আগে শুনি কি ব্যাপার?" মহিলা বলল।

বাড়িতে ঢুকে সত্যকীর্তি সব বলল। সব শুনে মহিলা সত্যকীর্তিকে ফল মিষ্টি খাইয়ে তার সামনে এক তরুণীকে এনে বলল, "এ মেয়েটা কেমন দেখতে বাবা?"

"খুব সুন্দর। এমন সুন্দর মেয়ে আমি এর আগে কোনদিন দেখিনি।" সত্যকীর্তি বলল।

"বাবা, এ হল আমার মেয়ে। আজন্ম বোবা। তুমি স্বার্থদেবীর কাছে বর চাও যাতে আমার এই মেয়ে কথা বলতে পারে। এ যদি কথা বলতে পারে তাহলে এর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।" মহিলা বলল।

সত্যকীর্তি পরের দিন স্বার্থদেবী দর্শন দিলে, তাঁকে বলল, "দেবী, যে মেয়েকে বিয়ে করতে চাই সে বোবা। এমন বর দিন যাতে সে কথা বলতে পারে।"

স্বার্থদেবী বর দিয়ে অদৃশ্য হলেন।

সত্যকীর্তি ছুটতে ছুটতে গেল ঐ মহিলার কাছে। ইতিমধ্যে সেই সুন্দরী মেয়ে কথা বলতে পারল। সত্যকীর্তি মহিলাকে বলল, "আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিন।"

"সত্যকীর্তি, তুমি তো অদ্ভুত আলা-ভোলা ছেলে? আমার এমন সুন্দর মেয়েকে কি তোমার মত বোকা ছেলের হাতে তুলে দেওয়া যায়? মেয়ে তো

আমার আর এখন বোবা নয়? ও কথা বলতে পারে। এখন ওর সঙ্গে বিয়ে হবে কোন রাজকুমারের! যে কোন রাজকুমার একে পেয়ে ধন্য হবে।" মহিলা বলল।

"এ অন্যায়!" সত্যকীর্তি বলল।

"না, এটাই ন্যায়। কালকে তুমি জিজ্ঞেস করছিলে না স্বার্থ কি? বলেছিলাম পরে বলব। তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে কোন রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াই আমার স্বার্থ।" মহিলা বলল।

সত্যকীর্তি আর দেরি না করে নিজের আস্তানায় ফিরে এল। অন্য মূর্তিকে পূজো করতে লাগল। কিন্তু ঐ মূর্তির অনেক-দিন পূজো করেও কোন দেবীর দর্শন পেল না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল।

শেষে দেবী দর্শন দিলে সত্যকীর্তি জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোন্ দেবী?"

"আমি নিস্বার্থ দেবী। তোমার স্বার্থ নেই এমন কোন বর চাইতে পার, পাবে।" দেবী বললেন।

সত্যকীর্তি ঐ দেবীকেও দর্শন দিতে বলল পরের দিন। তারপর সে চলে গেল সেই মহিলার কাছে। মহিলা বুড়ি হয়ে গেছে। সত্যকীর্তিকে দেখে পরিচয় পেয়ে তাকে ফল মিষ্টি খাইয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "বলতো বাবা কি খবর?"

সত্যকীর্তি সমস্ত ঘটনা বলে জানতে চাইল নিস্বার্থ মানে কি?

বুড়ি হেসে বলল, "জান বাবা, তুমি শুনে হয়ত খুশী হবে, আমার মেয়ের সঙ্গে কলিঙ্গ রাজার বিয়ে হয়েছে। ওদের সুন্দর মেয়ে হয়েছে নাম বৎসলা। কিন্তু বেচারী বোবা। তুমি দেবীর কাছে বর চাও যাতে বৎসলা কথা বলতে পারে। আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে নাতনীর বিয়ে দিতে পারব না।"

সত্যকীর্তি ফেরার পথে এক মুনিকে দেখতে পেল। তার কাছে সব শুনে মুনি বলল, "আমি তোমার অনেক আগে থেকে তপস্যা করছি। তপস্যা করে করে বুড়ো হয়ে গেছি। দেবীকে জিজ্ঞেস কর

তো কেন তিনি তোমাকে দর্শন দিলেন আমাকে দিলেন না ?" সত্যকীর্তি রাজী হয়ে ফিরে এল নিজের ডেরায়।

পরের দিন নিস্বার্থ দেবী আবার দর্শন দিলেন। সত্যকীর্তি দেবীর কাছে বৎসলা যাতে কথা বলতে পারে তার জন্য বর চাইল এবং মুনি যে কেন দেবীর দর্শন পেল না তা জানতে চাইল।

নিস্বার্থ দেবী কিভাবে বৎসলা কথা বলতে পারবে তা জানিয়ে সত্যকীর্তিকে বললেন, "মুনি দর্শন পাবে কি করে ? মুনি তপস্যা করে যেটুকু ফল অর্জন করছে তাতো ওর কমণ্ডলু গিলে ফেলছে। সে ঐ কমণ্ডলু কাউকে দিয়ে দিলে তবে তপস্যার ফল পাবে।" বলে দেবী অদৃশ্য হলেন।

সত্যকীর্তি ছুটে গিয়ে মুনিকে সব বলল। মুনি ঐ কমণ্ডলু তাকেই দিয়ে দিল। কমণ্ডলু হাতে পড়তেই সত্যকীর্তি নবীন উজ্জ্বল যুবকে রূপান্তরিত হলো।

সত্যকীর্তি ঐ মহিলার কাছে গিয়ে বলল, "দিদিমা, আপনার নাতনী নাকি ভাবি বরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলতে পারবে। নিস্বার্থদেবী আমাকে জানিয়েছেন।"

"আরে বাছা, আমি তো তোমাকে চিনতেই পারছিলাম না। ভালই হয়েছে, আজকে এসেছ। এই দুদিন হলো নাতনী আমার কাছে বেড়াতে এসেছে।" ঐ বুড়ি বলল।

ঠিক সেই সময় বুড়ির নাতনী, রাজকুমারী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সত্যকীর্তিকে দেখে বলল, "দিদিমা, কে এই যুবক ?"

বুড়ি নাতনীর মুখে কথা ফুটতেই অবাক হয়ে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে বলল, "তুই আর বোবা থাকবি না। এই যুবকই তোর ভাবি বর।"

কালক্রমে সত্যকীর্তি কলিঙ্গরাজের জামাই হল। আর পরবর্তীকালে সেই দেশের রাজা হল।

উপযুক্ত শাস্তি

কোন এক গ্রামে মাধব নামে এক ধনী ছিল। পয়সা কড়ির হিসেব নিয়ে তার বেশি মাথা ব্যথা ছিল না। ইচ্ছে করলে যে কোন লোক তাকে ঠকাতে পারত। কিন্তু পারত না তার বউ পার্বতীর জন্য। পার্বতী ছিল খুব বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণা। তার উপস্থিত বুদ্ধি ছিল প্রখর।

ঐ গ্রামে রমেশ নামে এক লোভী লোক ছিল। লোভী মাত্রেই মিথ্যার আশ্রয় নেয়। আর নিতও! সে থাকত মাধবের বাড়ির সামনেই। এক পুরুষ আগে মাধব ও রমেশের বাবাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল।

তবে ওদের দুজনের মারা যাবার পর এই দুই পরিবারে কোন আদান প্রদান ছিল না। যাতায়াতও বন্ধ ছিল। কারণ, রমেশ সব সময় মাধবের বিষয় সম্পত্তি মেরে দেওয়ার তালে থাকত। কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও পার্বতীর বুদ্ধির ফলে সে তা পারত না।

একবার রমেশ গোটা বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছিল। সেই সময় তার হাতে একটি কাগজ পড়ল। সেই কাগজ অনুসারে রমেশের বাবার কাছ থেকে যে মাধবের বাবা চার হাজার টাকা ধার নিয়েছিল তা মাধবের বাবার স্বাক্ষরসহ ভালভাবে প্রমাণ করা যায়।

মাধবের বাবা ধার নিয়েছিল ঠিক তবে শোধও দিয়েছিল। হয় গভীর বন্ধুত্বের জন্য অথবা ঐ চিরকুট তখন খুঁজে না পাওয়ার ফলে রমেশের বাবা সেই দলিল ফেরত দিতে পারে নি।

তবে খাতায় রমেশের বাবা লিখে রেখেছিল পরিষ্কার ভাষায় একটি কথা ঃ

ভানু ভট্টাচার্য

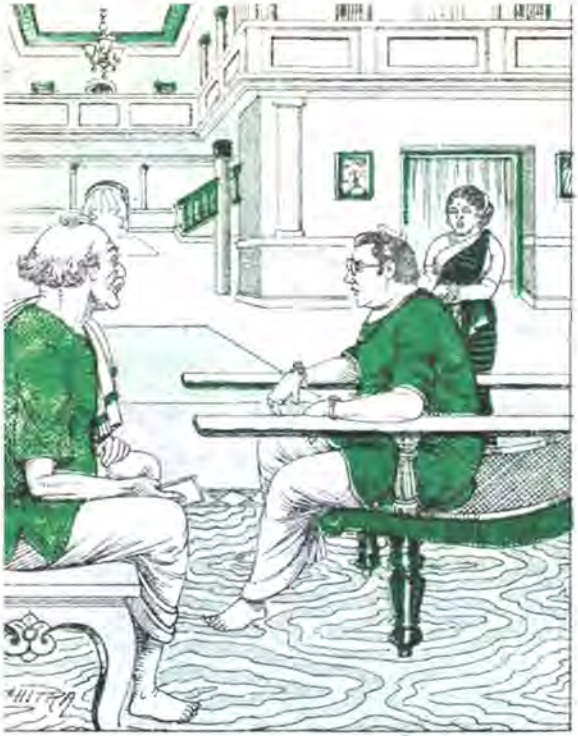

ধার শোধ বাবদ মাধবের বাবার কাছ থেকে চার হাজার টাকা পেলাম।

এই কাগজ রমেশের হাতে পড়াতে তার মনে হল সে স্বর্গ পেয়েছে। খাতায় লিখে রাখলেও নিশ্চয়ই অন্য কাগজে লিখে তার বাবা মাধবের বাবাকে দেয়নি। এই দলিল দেখিয়ে একটু চেষ্টা করলেই চার হাজার টাকা পাওয়া যেতে পারে।

এসব ভেবে রমেশ কাগজটা নিয়ে মাধবের বাড়ি গেল। একথা সেকথার পর ধারের প্রসঙ্গ উঠল।

রমেশ এটাই চাইছিল। মাধব বলল ওসব ধারতো অনেক আগেই শোধ দেওয়া হয়েছে। তখন রমেশ কাগজ দেখাল। মাধব অবাক হয়ে গেল। তার বউ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল। সে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সামনে।

মাধবের বউ রমেশকে খুব ভাল করেই চিনত। সে জানে যে রমেশ এমনি আসে না। কোন উদ্দেশ্য নিয়েই আসে। তাই তার ঘরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে মাধবের বউ আড়াল থেকে তার কথা শুনছিল এবং তার চালচলন লক্ষ্য করছিল।

মাধবের বউ কোন ভূমিকা না করে রমেশকে সরাসরি বলল, "আমরা জানতাম না যে আপনার কাছে এই কাগজ আছে। ধার নিশ্চয় শোধ করব। তবে বিচারকের সামনে শোধ করতে চাই।"

মাধবের বউ পার্বতীর প্রস্তাব শুনে রমেশ খুব খুশী হল। তার মনে হল টাকা তার হাতে এসে গেছে। বিচারক আর যাই হোক এরকম একটা জলজ্যান্ত দলিল অস্বীকার করবে কি করে। রমেশ জানত মাধব বোকা। তার বউ বড় কূট। আর সেই যখন রাজী হয়ে গেছে টাকা দিতে তখন আর বাধা কোন দিক থেকেই আসার কোন আশঙ্কা নেই।

রমেশের চলে যাওয়ার পর পার্বতী কিভাবে কি করবে সব একবার ভাল করে ভেবে নিল। তারপর সে গেল তার বান্ধবীর কাছে। তার বান্ধবীর স্বামীই বিচারক।

তাকে সে সব কথা জানাল। কিভাবে সে এই সমস্যার সমাধান করতে চায় তাও পরিষ্কার জানাল।

পার্বতীদের এই বিপদের কথা বিচারকের বউ তার স্বামীকে সময় এবং সুযোগমত বিস্তারিত জানিয়ে এ ব্যাপারে স্বামী যাতে সত্য অনুসন্ধানের জন্য পার্বতীকে সাহায্য করে তার জন্য অনুরোধ করল। এদিকে পার্বতী তার স্বামীকে বুঝিয়ে দিল পরের দিন বিচারকের সামনে তাকে কি করতে হবে, কি বলতে হবে।

পরের দিন রমেশ বিচারকের কাছে গিয়ে তার বাবার কাছে মাধবের বাবা যে টাকা ধার নিয়েছিল, তার স্বপক্ষে ঐ কাগজ দাখিল করল। এবং ঐ টাকা যাতে মাধব তাকে দেয় তার আবেদন করল বিচারকের কাছে। বিচারক যেন তাকে ঐ টাকা পাইয়ে দেয়।

বিচারক মাধবকে ডেকে পাঠিয়ে বলল, "তোমার বাবা কি রমেশের বাবার কাছে ধার নিয়েছিলেন ?"

মাধব দেরি না করে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ নিয়েছিলেন। তবে চার হাজার টাকা নয়। নিয়েছিলেন ছ হাজার টাকা। প্রমাণ হচ্ছে বাবার লেখা একটা কাগজ। ঐ দলিল অনুসারে আমার উচিত রমেশকে বাকি শোধ বাবদ ছ হাজার টাকা দেওয়া।"

বিচারক ঐ কাগজটাকে ঘেঁটেঘুটে বলল, "ওহে রমেশ, তুমি যে দলিল দিলে তাতে চার হাজার আছে, আর মাধব যে কাগজ দাখিল করেছে তাতে আছে ছ হাজার। কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমিই বলতো প্রকৃতপক্ষে কোন কাগজটা ঠিক।"

রমেশের মাথা ঘুরে গেল। তার এক কথায় আরও দু হাজার বেশি পাইয়ে দেবে বিচারক। অনেক ভেবে বলল, "আমার মনে হচ্ছে, এই চার হাজার হয়ত মাধবের বাবা শোধ করে দিয়েছিল। এই ছ হাজার টাকার দলিল আলাদা ঋণের। এই ঋণ উনি শোধ করতে পারেন নি। আমি বাড়িতে

গিয়ে খাতাপত্তর ইত্যাদি আনছি আপনি আমাকে একটু সময় দিন।" সময় পেয়ে রমেশ একটি খাতা এনে বিচারককে দেখিয়ে বলল, "এই দেখুন ঐ চার হাজার আমার বাবা পেয়ে গেছেন, খাতায় লেখা আছে। এই ছ হাজার টাকা আলাদা ঋণ উনি নিয়েছিলেন। এটা বাবা মাধবের বাবার কাছ থেকে আর ফেরত পাননি।"

ঐ খাতা ও চার হাজারের কাগজ দেখিয়ে বিচারক সবাইকে বলল, "তাহলে ধরে নিতে হবে যে এই দলিলের চার হাজার টাকা শোধ হয়ে গেল।"

উভয় পক্ষ এবং অন্যেরা মাথা নেড়ে সায় দিল। তারপর বিচারক বলল, "এখন মাধব যে দলিল এনেছে তার ভিত্তিতে মাধবের উচিত রমেশকে ছ হাজার টাকা ফেরত দেওয়া।"

বিচারকের কথা শুনে রমেশ খুব খুশী হয়ে মাথা নাড়ল। তখন বিচারক বলল, "কিন্তু রমেশের দলিল ও মাধবের দলিল পাশাপাশি রেখে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই ছ হাজারের দলিলে যে সইটা আছে তা মাধবের বাবার নয়। অতএব, এই দলিল বাতিল। আর ঐ ছ হাজার টাকা রমেশের বাবার কাছ থেকে ধার নেওয়ার ব্যাপারটাও মিথ্যা।"

রমেশের মুখ চুণ হয়ে গেল। বিচারক আবার বলল, "রমেশ তুমি সহজ সরল মানুষ মাধবকে ঠকানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছ। যে ঋণ শোধ হয়ে গেছে, সেই টাকা আবার আদায় করার তাল করেছিলে। অতএব, আর তোমাকে আমাদের এই গ্রামে রাখা যাবে না। কালকের মধ্যে তুমি স্বপরিবারে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে।"

এই ঘটনার ফলে রমেশ অপমান বোধ করল। পার্বতীর বুদ্ধি ও কৌশলের কাছে রমেশকে পরাজিত হয়ে স্বপরিবারে গ্রাম ছাড়া হতে হল।

মহাভারত

ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে যুধিষ্ঠির ভীমকে দুর্যোধনের ভবন, অর্জুনকে দুঃশাসনের ভবন, নকুলকে দুর্মর্ষণের ভবন এবং সহদেবকে দুর্মুখের ভবন দান করলেন। তিনি পুরোহিত ধৌম্য ও সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণকে বহু ধন দিলেন। ভৃত্য, আশ্রিত অতিথি প্রভৃতিকে অভীষ্ট বস্তু দিয়ে তুষ্ট করলেন। আর গুরু কৃপাচার্যের উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থাও করে দিলেন। তা ছাড়া তিনি বিদুর ও যুযুৎসুকেও সম্মানিত করলেন।

কৃষ্ণ যে ঘরে ছিলেন, যুধিষ্ঠির সেখানে গিয়ে দেখলেন যে কৃষ্ণ পীত কৌষেয় বস্ত্র পরে দিব্যাভরণে ভূষিত হয়ে বক্ষে কৌস্তভ মণি ধারণ করে একটি বড় পালঙ্কের উপর ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন।

যুধিষ্ঠির করজোড়ে সম্ভাষন করলেন। কিন্তু কৃষ্ণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন।

তখন যুধিষ্ঠির বললেন, "হে কেশব, তুমি ধ্যান করছ! ত্রি-জগতের সব কুশল তো? ভগদান, তুমি যে পাষাণের মত নিশ্চল স্তব্ধ হয়ে রয়েছ। যদি গোপন কিছু না হয় আর আমার যদি শোনবার যোগ্যতা থাকে তবে তোমার এইরূপ ধ্যানের কারণ আমাকে জানাও।"

কৃষ্ণ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, "শর-শয্যায় ভীষ্ম আমাকে ধ্যান করছেন। তাই আমার মন তাঁর চিন্তায় মগ্ন ছিল।

আপনার যা জানবার আছে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "হে মাধব, তোমাকে সামনে রেখেই আমরা যাব ভীষ্মের কাছে।"

কৃষ্ণ সাত্যকিকে আদেশ দিলেন, "আমার রথ প্রস্তুত করতে বল।"

কৃষ্ণ, সাত্যকি, যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা, কৃপাচার্য, যুযুৎসু এবং সঞ্জয় রথে করে কুরুক্ষেত্রের মাঠে উপস্থিত হলেন। সকলেই দেখতে পেলেন, ওঘবতী নদীর তীরে পবিত্র স্থানে ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত। মুনিগণ উপাসনা করছেন।

কৃষ্ণ একটু কাতরস্বরে ভীষ্মকে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। পরে কৃষ্ণ বললেন, "পুরুষশ্রেষ্ঠ, যখন আপনি সুস্থ শরীরে বিশাল ও সমৃদ্ধ রাজ্যে বাস করতেন তখন হাজার নারী পরিবৃত হয়েও আপনি উর্দ্ধরেতা ছিলেন। এভাবে শরশয্যায় শুয়ে মৃত্যুকে রোধ করতে পারে এমন আপনি ছাড়া আর কেউ করতে পারে তা আমাদের জানা নেই। সব রকম ধর্মতত্ত্ব আপনার জানা আছে। এই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব জ্ঞাতি বধের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত। এঁর দুঃখ দূর করুন আপনি। আপনার জীবনের আর ছাপ্পান্ন দিন বাকি আছে। তার পরেই আপনি দেহত্যাগ করবেন। পরলোকে আপনার সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হবে। সে কারণে যুধিষ্ঠিরাদি ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন আপনার কাছে।"

কৃতাঞ্জলি হয়ে ভীষ্ম বললেন, "নারায়ণ, তোমার কথা শুনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। বাক্যবিশারদ, তোমার কাছে আমি আর কি বলব? সব কথাই তোমার বক্তব্যে আছে। গুরুর উপস্থিতিতে শিষ্যতুল্য আমি কি উপদেশ দেব?"

কৃষ্ণ বললেন, "গঙ্গানন্দন ভীষ্ম, আমার বরে গ্লানি, মোহ, কষ্ট, ক্ষুধা, তেষ্টা আপনার কিছুই থাকবে না। সব জ্ঞান আপনার কাছে প্রকাশ পাবে। ধর্ম ও অর্থের তত্ত্ব বিষয়ে আপনার বুদ্ধি প্রখর

হবে। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আপনি সবই দেখতে পাবেন।" কৃষ্ণের বলার পর আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি, নানা বাদ্য, অপ্সরাদের গান ও সুগন্ধযুক্ত বায়ু বইতে লাগল।

পথে কৃষ্ণ পরশুরাম সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। ভৃগুর বংশে জমদগ্নি নামে এক মহাতপা ঋষি ছিলেন। তাঁর এক তেজস্বী গুণবান পুত্র ছিল। তার নাম পরশুরাম। পরশুরামের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব বলেছিলেন, "পরশুরাম, তুমি যে কি চাও তা আমি জানি। অপাত্র ও অসমর্থ আমার অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে না। যখন সময় হবে তখন তোমাকে আমার অস্ত্র দেব।" তারপর গন্ধমাদন পর্বতে আরও বহু বছর ইন্দ্রিয় দমন করে তপস্যা করলেন এবং অবশেষে বহু অস্ত্র ও কুঠার প্রাপ্ত হলেন।

সেই সময়ে কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন দত্তাত্রেয়ের অনুগ্রহে সহস্র হাত প্রাপ্ত হলেন। অসংখ্য রাজাকে পরাজিত করে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন এবং বহু ব্রাহ্মণকে প্রচুর পরিমাণে ধন দান করলেন। তারপর অগ্নিদেব যখন সেই অঞ্চল দহন করতে লাগলেন তখন বশিষ্ঠ ভীষণ রেগে গিয়ে অভিশাপ দিয়ে বললেন, "অগ্নি যে ভাবে আমার আশ্রম পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে সেইভাবে তোমার হাত পরশুরাম নষ্ট করে ফেলবে।"

এই অভিশাপের কথা শুনে অর্জুন একটুও বিচলিত হন নি।

পরে অর্জুনের অহঙ্কারী পুত্র কার্তবীর্য পরশুরামের আশ্রমে বেড়াতে গিয়েছিল। পরশুরামের অনুপস্থিতিতে জোর করে আশ্রম থেকে হোম ধেনু নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। তাতে চটে গিয়ে পরশুরাম কার্তবীর্যার্জুনের এক হাজার হাত কেটে ফেলেছিলেন। পরে উভয় পক্ষে শত্রুতা চরমে উঠল। হৈহয় দেশের লোক এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে পরশুরামের আশ্রমে গিয়ে তাঁর পিতা জমদগ্নির মাথা কেটে ফেলেছিল। তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পরশুরাম সারা পৃথিবীর ক্ষত্রিয়দের বধ

করার প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি যে শুধু অর্জুনের পুত্র ও নাতিদের বধ করলেন তাই নয়, পৃথিবীর যেখানে যত ক্ষত্রিয় ছিল তাদের খুঁজে খুঁজে এনে বধ করলেন।

তারপর শান্ত হয়ে তিনি তপস্যা করতে বসলেন। সেই সময় একবার বিশ্বমিত্রের পুত্র পরাবসু পরশুরামের কাছে গিয়ে বলল, "প্রতিজ্ঞা ছিল সমস্ত ক্ষত্রিয়কে বধ করার। কিন্তু তাত হল না।"

তারপর পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে পরাবসুর কাছে বাকি কারা আছে জেনে তাদের ধরে হত্যা করলেন। এদের মধ্যে বৃদ্ধ, বালক ও গর্ভবতীও ছিল। সব ক্ষত্রিয়কে মেরে পরশুরাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করে পৃথিবী জয় করলেন ও কশ্যপের হাতে সমস্ত পৃথিবী দান করে দিলেন।

কশ্যপ পৃথিবীকে দান স্বরূপ গ্রহণ করে বললেন, "পরশুরাম, শুধু বসার স্থান আমি দিতে পারি। ঐস্থানে বসে আপনি তপস্যা করতে পারেন।"

পরে কশ্যপ ব্রাহ্মণদের পৃথিবীতে রাজত্ব করার অধিকার দিয়ে তপস্যা করতে বনে গেলেন। ব্রাহ্মণদের শাসনকালে অরাজকতা এবং দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার বেড়ে গেল।

কশ্যপ এই ব্যাপারটি জানতে পেরে পৃথিবীতে শাসন করবার জন্য ক্ষত্রিয়দের খোঁজ করলেন। তখন উনি বহু ক্ষত্রিয়ের সন্ধান পেলেন। হৈহেয়রা তাদের সন্তানদের গোপনে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল। পুরু বংশের বিদূরথ ঋক্ষ পর্বতে পালিত হল। সৌদাস নামক ক্ষত্রিয়কে পরাশর পালন করলেন। শিবির পুত্রকে গরুগুলো রক্ষা করেছিল বলে তার নাম হয়েছিল গোপতি। প্রদর্দের পুত্র বৎসও জীবিত ছিল। গুপ্ত নামক ক্ষত্রিয়কে গৌতম আশ্রয় দিয়েছিলেন। বৃহদ্রথকে বাঁদরগুলো রক্ষা করেছিল। মরুত্ত বংশের ক্ষত্রিয় সন্তানদের সমুদ্র বাঁচিয়েছিল। আরও বহু ক্ষত্রিয় স্বর্ণকার প্রভৃতিদের আশ্রয়ে ছিল। কশ্যপ এদের সবাইকে ডেকে রাজা করে দিলেন।

Vanker

হস্তিনাপুরে এসে যুধিষ্ঠির পুরবাসী এবং জনপদবাসীদের যথাযোগ্য সম্মান করলেন। তারপর সকলকে গৃহে যাবার অনুমতি দিলেন। পুত্রহীনা পতিহীনা নারীদের প্রচুর অর্থ দিলেন।

পঞ্চাশ দিন পরে তিনি ভীষ্মের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

তাঁরা ভীষ্মের নিকটে গিয়ে দেখলেন ব্যাসদেব, নারদ ও অসিতদেবল তাঁর কাছে বসে রয়েছেন। নানা দেশের রাজা ও রক্ষিগণ তাঁকে রক্ষা করছেন।

যুধিষ্ঠির সকলকে অভিবাদন করে ভীষ্মকে বললেন, "হে জাহ্নবীনন্দন, আমি যুধিষ্ঠির। আমার ভাইয়েরা আপনার পুত্র জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র এবং অমাত্যগণ সহ বাসুদেবও এসেছেন। আপনি একবার চোখ মেলে দেখুন সবাইকে। আপনার শেষকৃত্যের জন্য আমি সব রকম প্রয়োজনীয় জিনিসের আয়োজন করেছি।"

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে ভীষ্ম চোখ মেলে সকলকে দেখলেন। যুধিষ্ঠিরের হাত ধরে বললেন, কুন্তীপুত্র, আটান্ন রাত এই শরশয্যায় শুয়ে আছি। যেন শত বৎসর পার হয়ে গেছে। এখন শুক্ল পক্ষ।"

তারপর ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "রাজা, তুমি ধর্মজ্ঞ। শোক করা তোমার সাজে না। ভবিতব্য যা তাই হয়েছে। পাণ্ডুর পুত্ররা ধর্মত তোমার পুত্রের মত। তুমি ধর্মসঙ্গতভাবে ওদের পালন কর।"

এরপর ভীষ্ম কৃষ্ণকে বললেন, "হে বাসুদেব, হে শঙ্খচক্র গদাধর ক্রিবিক্রম ভগবান, তোমাকে নমস্কার। আমি তোমার একান্ত ভক্ত। পুরুষোত্তম, তুমি আমাকে ত্রাণ কর। একান্ত অনুগত পাণ্ডবগণকে তুমি রক্ষা কর। আমি দুর্যোধনকে বলেছি বার বার, যে দলে কৃষ্ণ সেই দলে ধর্ম। আর যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। কিন্তু সেই মূর্খ দুর্যোধন আমার কথা শোনে নি। হে মাধব, আমি এখন এ দেহ ত্যাগ করব। তুমি আদেশ কর যেন আমার পরম গতি হয়।"

তারপর ভীষ্ম একে একে সবাইকে সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন করে বললেন যুধিষ্ঠির-কে, "মহারাজ, আচার্য ও ঋত্বিকগণ তোমার পূজনীয়।"

ভীষ্মের কাছে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন সবাই নীরব হলেন। ভীষ্মের প্রাণবায়ু আস্তে আস্তে বেরিয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগল। ভীষ্মের শরীর ক্রমশ বাণমুক্ত হতে লাগল। তাঁর শরীরের ব্যথা যন্ত্রণা একে একে কমতে লাগল। পুষ্প-বৃষ্টি হতে লাগল। দুন্দুভি বাজতে লাগল। বিদুর ও যুযুৎসু চিতা তৈরি করতে লাগ-লেন। ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠির ভীষ্মের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। হোম প্রভৃতির পর ভীষ্মের দেহ চন্দন কাঠ অগুরু প্রভৃতি দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের দেহে অগ্নিদান করলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষ করে ভাগীরথীর তীরে যথাবিধি তর্পন করলেন। সেই সময় যুধিষ্ঠির শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। তখন কৃষ্ণের কথায় ভীম যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। সান্ত্বনা দিতে দিতে ভীমও নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না। তখন যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্র বুঝিয়ে বললেন, "শতপুত্রে হারিয়ে তো আমার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ার কথা। কোই আমি তো ভেঙ্গে পড়ছি না, গান্ধারী তো কাঁদছে না। তোমরা তো যুদ্ধে জয়ী

হয়েছ। তোমরা কাঁদছ কেন? গোটা রাজ্য এখন তোমাদের অধীন। তোমাদের এখন অনেক কাজ।"

মহর্ষি ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার উপদেশ দিলেন।

তখন যুধিষ্ঠির বললেন, "মহাত্মা, অশ্ব-মেধ যজ্ঞ করার জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হয়। আবার অল্প কিছু দান করে পিতামহ ভীষ্মের যজ্ঞ করাও আমার ভাল লাগছে না। অথচ এখন আমার হাতে তেমন অর্থ নেই যা দিয়ে আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে পারি। দেশবাসীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের কাছে কর আদায় করতে যাব কি করে?

একথা শুনে ব্যাসদেব কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "অর্থের অভাব তোমার হবে না। প্রাচীন কালে মরুত্ত রাজা যজ্ঞ করে বিপুল ধন ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন। সেই ধন হিমালয় পর্বতে রয়েছে। সেখান থেকে প্রচুর ধন এনে করতে পার।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "মরুত্ত রাজা কোন সময়ে রাজত্ব করতেন? তিনি কিভাবে অত ধন সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন?"

ব্যাসদেব বললেন, "তাহলে তোমাকে মহারাজা মরুত্তের কাহিনী শোনাই। ত্রেতাযুগে মনু বংশের করন্ধম রাজার এক পুত্র ছিলেন। সেই সর্বগুণ সম্পন্ন পুত্রের নাম অভিক্ষিৎ। তিনি বৃহস্পতিকে পুরোহিত করে একশোটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তারপর তিনি বিষ্ণুর সমান খ্যাতিলাভ করেন।

তাঁর পুত্র মরুত্ত বাপের চেয়ে যোগ্য রাজা ছিলেন। মরুত্তর যজ্ঞ করার উদ্দেশ্যে হাজার হাজার স্বর্ণপাত্র সহ অন্যান্য উপকরণও সোনার তৈরি করালেন। তারপর ঐ সব নিয়ে তিনি হিমালয়ের উত্তর দিকে মেরু পর্বতের কাছে একটি ছোট পাহাড়ে যজ্ঞের ব্যবস্থা করলেন। মরুত্তের সঙ্গে বহু রাজা সেখানে গিয়েছিলেন।

এই যজ্ঞ করার জন্য বৃহস্পতির পুরোহিত করার কথা ছিল। কিন্তু ইন্দ্র রাজা মরুত্তের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতেন। তাই তিনি বৃহস্পতিকে ঐ যজ্ঞ করতে বারণ করেছিলেন। তখন মরুত্ত বৃহস্পতির ছোট ভাই সংবর্তকে পুরোহিত হিসেবে নিযুত করলেন। তারপর তাল তাল সোনা মরুত্ত ব্রাহ্মণদের দান করতে লাগলেন। অনেক দান করার পরেও সব সোনা দান করা যায়নি। এখনও প্রচুর সোনা সেখানে পড়ে রয়েছে। তুমি সেই সোনা নিয়ে আসতে পার।" ব্যাসদেব এইভাবে যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিলেন।

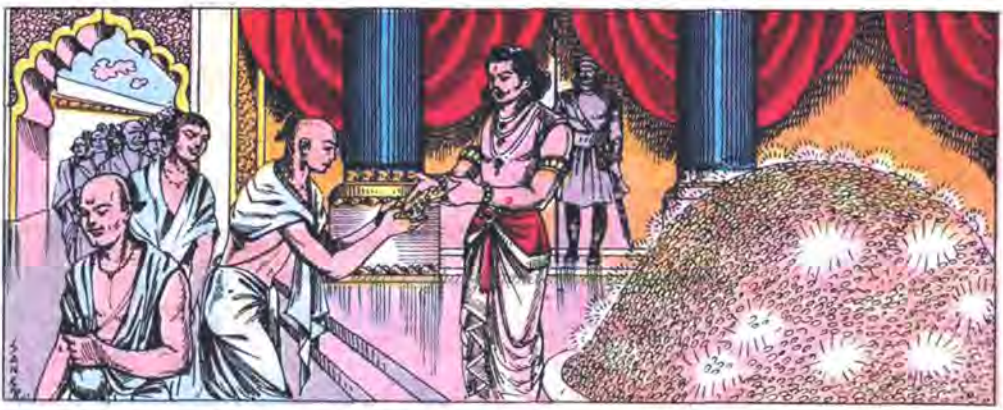

মিত্র-ভেদ

দশ

বুদ্ধি আর কৌশলে খরগোশ কিভাবে যে সিংহকে মেরে ফেলল, সেই কাহিনী দমনকের কাছে শুনে করটক বলল, "সব সময় যে কৌশলে কাজ সারা যায় তার কি মানে আছে ?"

"বিপদের হাত থেকে বাঁচার পথ করে রাখতে হবে। সাহস করে কোন কাজে না নাবলে সে কাজ করা যায় না। সাহসীদের দেবতারাও সাহায্য করে। এক তাঁতী সাহস করে বিষ্ণুর রূপ ধরে এক সুন্দর রাজকুমারীকে পেয়েছিল।" দমনক বলল।

"শুধু সাহসে ভর করে রাজকুমারীকে পেল কি করে ?" করটক বলল।

মহাবিষ্ণু রূপ ধারণ করে অভিনয়কারী তাঁতীর কাহিনী দমনক শুরু করল।

তাঁতীর বিষ্ণু হওয়ার কাহিনী

বঙ্গদেশে পুণ্ড্র বর্ধন নামে এক নগর ছিল। সেই নগরে এক তাঁতী ও ছুতোরের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। ওরা দুজনে নিজের নিজের পেশায় ছিল খুব দক্ষ। ফলে তাদের কাজের কদর ছিল, তাদের উপার্জনও ছিল বেশি। যেমন রোজগার করত তেমনি খরচও করত। প্রায় সুগন্ধি ফুল গুঁজে গায়ে আতর মেখে সুগন্ধি তামাক ওরা খোশ মেজাজে খেত।

একবার ঐ নগরে বিরাট উৎসব পালিত হলো। উৎসবে সবাই ভাল পোষাক পরে দলে দলে আসে। তাঁতী এবং ছুতোরও সেই উৎসবে ভাল ভাল পোষাক পরে গিয়েছিল। ওরা ভালভাবে দেখতে লাগল

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

কে কি ধরণের পোষাক এবং অলঙ্কার পরেছে।

ওরা হঠাৎ দেখতে পেল সুদর্শনা রাজকুমারী জানালায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে। রাজকুমারী পূর্ণ যৌবনা ছিল। তার সৌন্দর্য যেন অতুলনীয়। তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল তাঁতী। কিন্তু সে নিজের মনোভাব প্রকাশ করল না। রাত্রে শুয়ে শুয়ে রাজকুমারীর কথাই চিন্তা করতে লাগল, "কথায় বলে যেখানে সৌন্দর্য সেখানেই সুখ। কিন্তু ঐ সুন্দরী রাজকুমারী আমার মনে এভাবে ব্যথা দিচ্ছে কেন? সে কি তার নিজের ঘর পোড়ায়? তা না হলে আমার মন পোড়াচ্ছে কেন? ভগবান যদি আমাকে প্রাণে মারতে চায় তো অন্য কোন ভাবে মারতে পারত। এভাবে এক রূপবতী রাজকুমারীকে চোখের সামনে এনে আমাকে জ্বালিয়ে মারছে কেন? তাহলে কি ভগবান বুদ্ধের কথা মিথ্যা যে জগতের সব কিছুই ক্ষণিকের? সত্য নয়, সব ভ্রম? ভ্রম যদি হয় তাহলে রাজকুমারীর প্রতি আমার যে দুর্বলতা জেগেছে সেটাই বা ভ্রম হল না কেন? সেটা মিথ্যা হয়ে, মনের ভ্রম হয়ে মন থেকে সরে গেল না কেন?"

এইসব এলোমেলো চিন্তা তার মনকে সারারাত ধরে অস্থির করে রেখেছিল। তার চোখ থেকে ঘুম ছুটে গিয়েছিল সেই রাত্রে। অন্য দিনের মত সেদিনও তার বন্ধু ছুতোর সেজেগুজে এসে দেখে সে মড়ার মত খাটে পড়ে আছে।

ছুতোর বন্ধুটি জিজ্ঞেস করল, "বন্ধু, তোমার কি হয়েছে?"

তাঁতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নীরব রইল। ছুতোরের একটু আধটু চিকিৎসা করার বিদ্যা ছিল। সে তার বন্ধুর নাড়ী টিপে, বুকে মাথায় হাত দিয়ে বলল, "বন্ধু তোমার তো জ্বর হয়েছে। কিন্তু এতো সাধারণ জ্বর নয়? মনে হচ্ছে, এ তোমার ভালবাসার জ্বর হয়েছে। কি ব্যাপার বলতো? আমাকে সব খুলে বল। রোগ ধরতে সুবিধে হবে। কি বলবে তো না কি?"

তাঁতী উঠে খাটে বসে বলল, "লোকে বলে ব্যথার কথা বউ অথবা বন্ধুকে বললে ব্যথা কিছুটা কমে।"

সব কথা শুনে ছুতোর বলল, "মহারাজা সুপ্রতিবর্মা ক্ষত্রিয়। আর তুমি হলে বৈশ্য। উচ্চ বর্ণের পরমাসুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করার কথা ভাবতে তোমার ভয়, লজ্জা বা সঙ্কোচ হচ্ছে না?"

"ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করে একজন ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রের কন্যাকে বিয়ে করতে পারে। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে ঐ রাজার স্ত্রী বৈশ্য-কন্যা? এবং তার গর্ভজাত কন্যাই এই রাজকুমারী? তা যদি না হয় এই রাজকুমারীর প্রতি আমার ভালবাসা জাগল কেন? আমার মনে যে কি হচ্ছে তা একমাত্র অন্তরাত্মাই জানেন। এ আমি কিছুতেই বুঝিয়ে বলতে পারব না।" তাঁতী বলল।

"তাহলে এখন কি করা যাবে?" ছুতোর জিজ্ঞেস করল।

"আমার জন্য তুমি একটা চিতা তৈরি কর। বুঝতে পারছি রাজকুমারীকে আমি কোন ভাবেই পাব না। আর ওকে না পেলে আমার পক্ষে এক দিনও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এভাবে তিলে তিলে দগ্ধে মরার চেয়ে একবারে চিতেয় উঠে মরা অনেক ভাল। শারীরিক এবং মানসিক

রোগ পুষে বাঁচার কোন মানে হয় না।" তাঁতী বলল।

"ওসব বাজে চিন্তা ছেড়ে দাও। এ সংসারে এমন কিছু নেই যা ধন এবং বুদ্ধি বলে করা যায় না। তুমি এখন ওঠ। চান কর, খাও। অন্যদিনের মত যা করতে তাই কর। কিভাবে রাজকুমারীকে তোমাকে পাইয়ে দেওয়া যায় সে চিন্তা আমি করছি।" ছুতোর বলল।

বন্ধুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রতি তাঁতীর আস্থা ছিল। তাই সে ছুতোর বন্ধুর কথামত রাজকুমারীর ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা না করে যথারীতি নিজের কাজ করে যেতে লাগল। কিছুদিন পরে ছুতোর গরুড় আকৃতির

বিমান নিয়ে হাজির হল। বিমানটির গায়ে সুন্দর রঙ লাগানো ছিল। সেটি চালানোর যন্ত্রও ছিল তাতে। ঐ ধরণের বিমানকে কেউ কোনদিন দেখেনি।

তৈরির গুণে আর রঙের বাহারে সেটি হয়ে উঠেছিল জীবন্ত গরুড় এবং গতিতে বিমান।

ছুতোর তার তাঁতী বন্ধুকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিল, কোন্ যন্ত্র নাড়লে বিমান উপরে উঠবে, কোন্‌টি নাড়লে বিমান নিচে নাববে এবং কোন্‌টি টিপলে বিমান সোজা সামনের দিকে যাবে। তাঁতী গরুড় আকৃতির বিমান চালানোর কায়দা কানুন ভালভাবে শিখে নিল।

তারপর ছুতোর বলল, "দেখ বন্ধু, মহারাজ সুপ্রতিবর্মা ও তার পরিবারের প্রত্যেকে ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত। ওদের পূর্ব পুরুষের কাকে যেন স্বয়ং বিষ্ণু এসে বর দিয়েছেন বলে প্রচার আছে। তাই বলছি তুমি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম নিয়ে রাজমহলের ছাদে গরুড় বিমানে করে নাব। আমি গোপনে খবর নিয়ে জেনেছি যে ঐখানেই রাজকুমারীর শোবার ঘর আছে। তুমি বিষ্ণুর রূপ ধরে অভিনয় করে সহজেই রাজকুমারীকে বিয়ে করতে পার।"

সারাদিন বেশ হাসিখুশী থেকে রাত্রে তাঁতী মূল্যবান রেশমী বস্ত্র ধারণ করে গরুড়-বিমানে করে রাজকুমারীর শয়নকক্ষে গিয়ে হাজির হল।

জ্যোৎস্না রাত। রাজকুমারীর গায়ে প্রসন্ন জ্যোৎস্নার আলো পড়ছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে গরুড় বাহনে করে বিষ্ণুকে আসতে দেখে ভক্তিতে, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে রাজকুমারী তাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল, "প্রভু, আমার প্রতি দয়ালু হয়ে আপনি যে আমার কাছে অনুগ্রহ করে এসেছেন তার কি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে প্রভু?"

পুরাতন রঙ্গালয়

ইষ্ট্রিয়ার (প্রাচীন ইটালীর) বন্দরাঞ্চলে পোলার কাছে রোমানরা ২৫০০০ লোকের বসার উপযুক্ত রঙ্গালয় তৈরি করিয়েছিল। এই নগর ১১৪৮ খৃঃ বেনিশিয়ানোর অধীন হয়ে গেল। ওরা এই রঙ্গালয়ের শিলাফলকগুলি তুলে নিয়ে বাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করল। ১৮৫০ খৃঃ পোলা নগর অষ্ট্রিয়দের অধীনে এলে তারা রোমানদের আমলের মত পোলা নগরকে আবার প্রসিদ্ধ বন্দরের নগরে রূপান্তরিত করল।

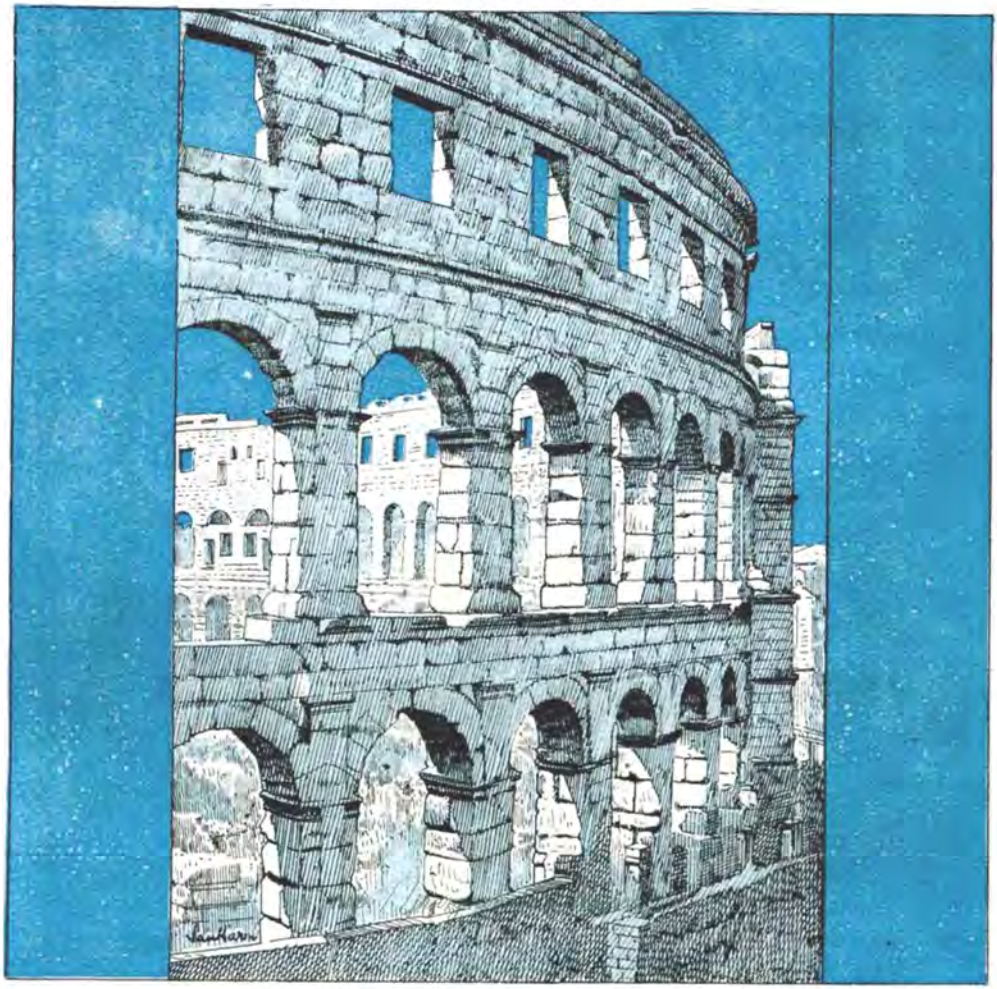

ফটো : শম্ভু মুখোপাধ্যায়

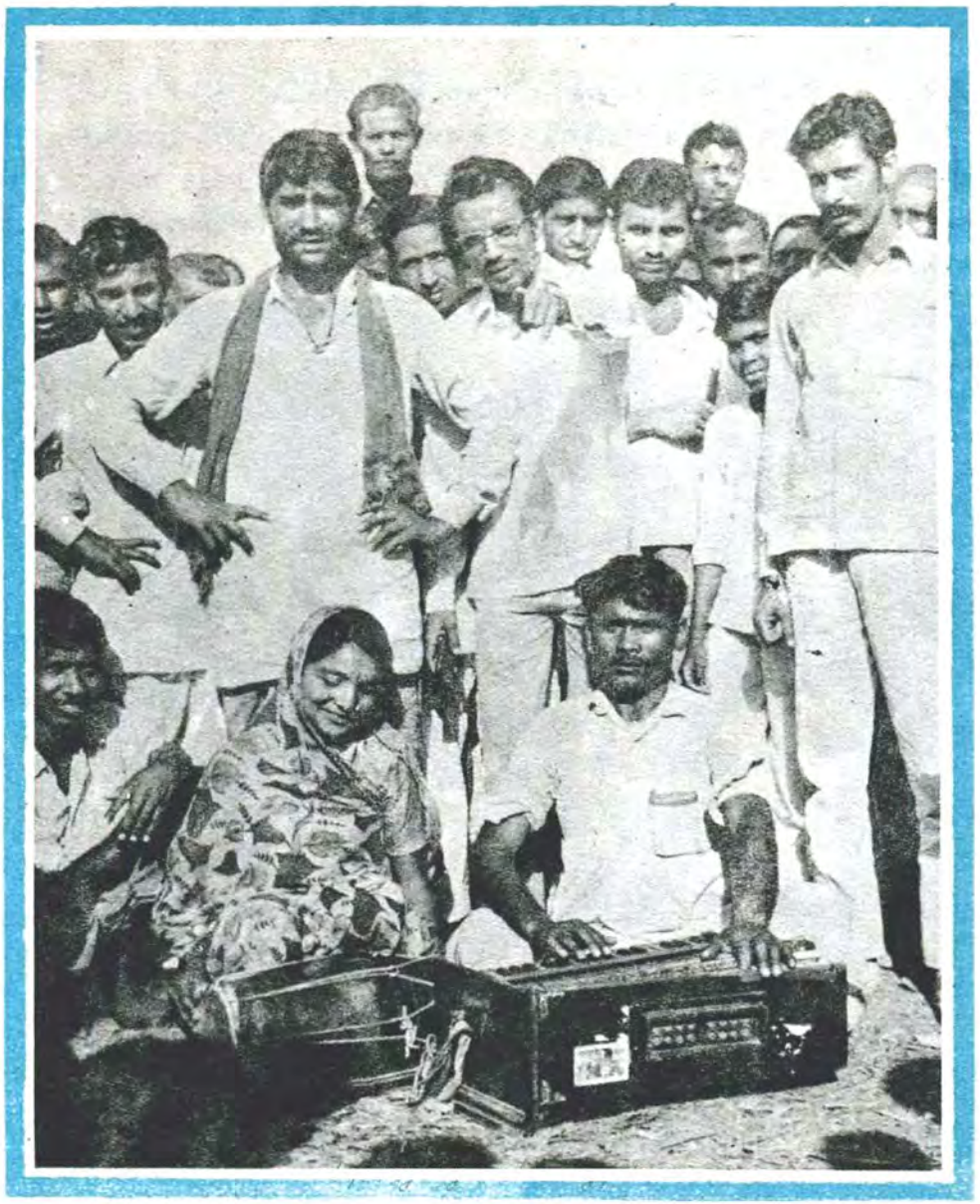

পুরস্কৃত নাম

আনন্দে সব মাতোয়ারা

পুরস্কার পেলেন সৌমেন মজুমদার

ফটো : বিষাণ মহেশ্বরী

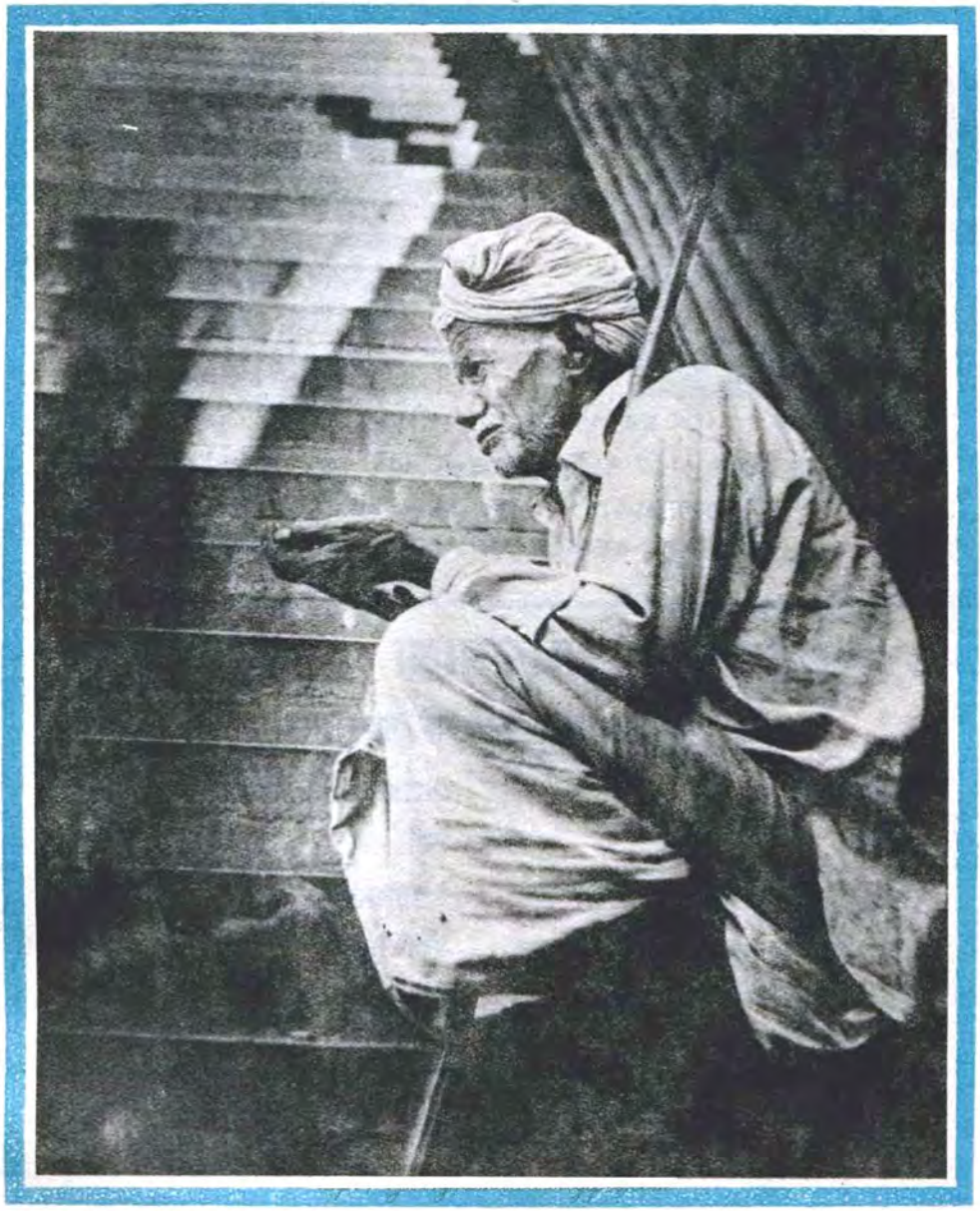

আস্তাড়া, ডিমারীহাট
মেদিনীপুর

গরিবের মন দুঃখে ভরা

পুরস্কৃত
নাম

ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা

* ফটো-নামকরণ ২০শে জুন '৭৪-এর মধ্যে পৌছানো চাই।
* ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো আগষ্ট '৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

অমরবাণী	৮	চোরের উপর বাটপাড়ি	৩৩
যক্ষপর্বত	৯	দুটো বর	৪১
মনের পরিবর্তন	১৭	উপযুক্ত শাস্তি	৪৫
রাজপ্রতিনিধির ঘোড়া	২৩	মহাভারত	৪৯
ঠেকে শেখার পরে	৩১	মিত্রভেদ	৫৭

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র
আরাম

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র
আনন্দ

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-600026. Controlling Editor : 'CHAKRAPANI'

Photo by: **PRABHAKAR MAHADIK**

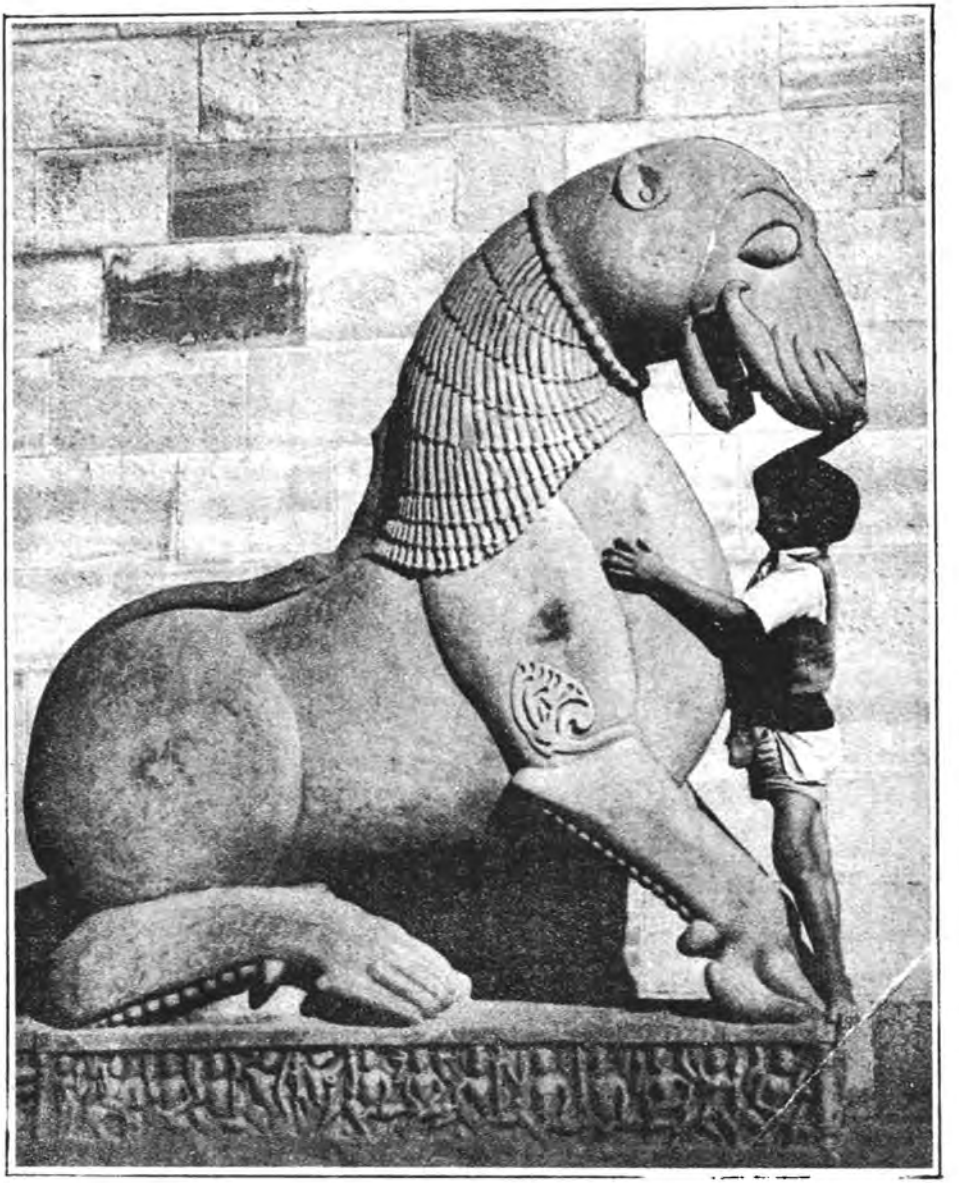

RECREATION

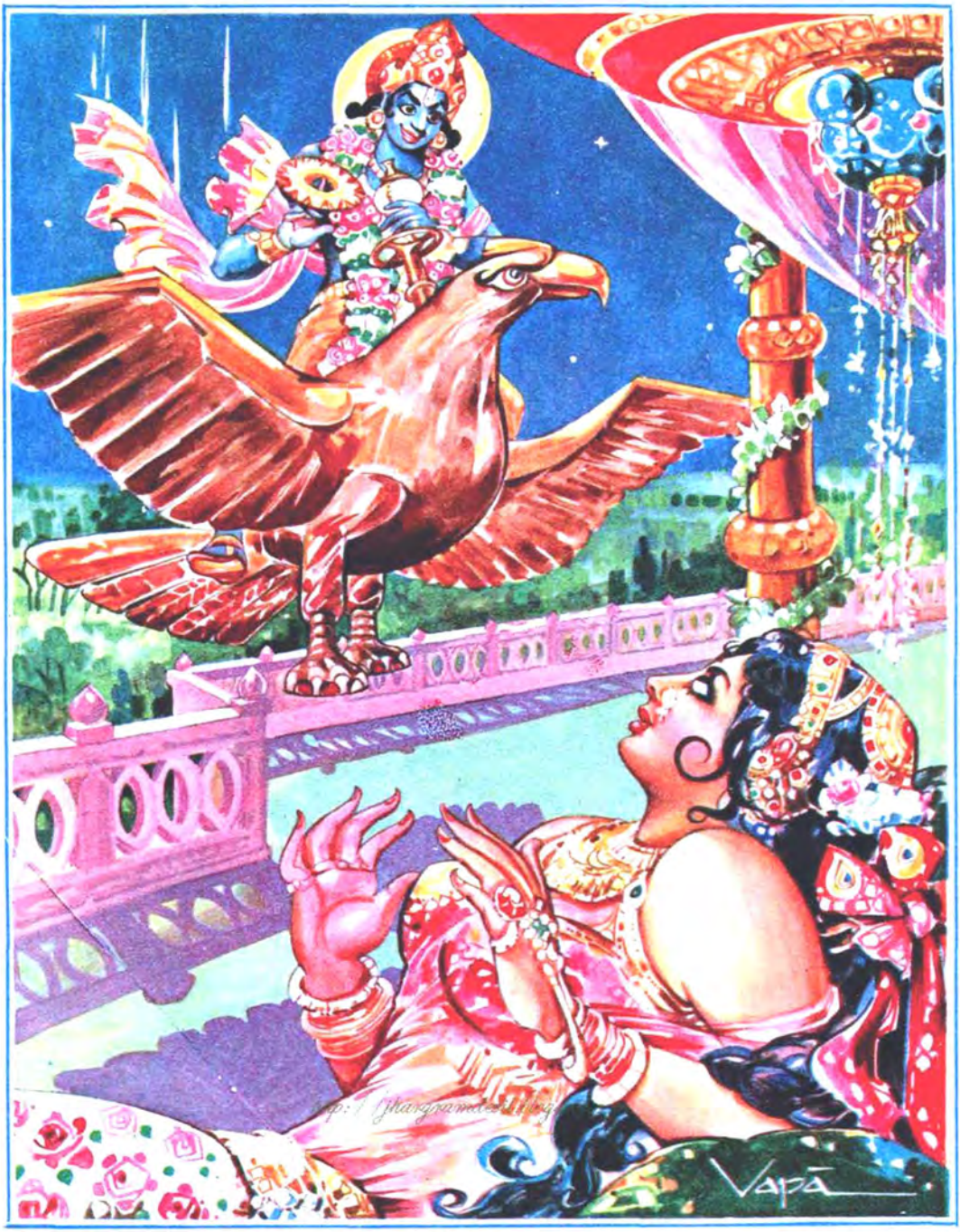

মিত্রভেদ